তৃতীয় অধ্যায়

দেবেশ রায়ের কথনবিশ্বের সাধারণ পরিচয় ঃ ব্যক্তি ও সৃষ্টি

১

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় চিরকালই তাঁর সাহিত্য ভুবনে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তির চূড়া আরোহন করার কোনো স্বপ্ন তিনি দেখেননি। জীবনকে জানার তাগিদে তিনি ছুটতে থাকেন গভীর থেকে গভীরতর বাস্তবের দিকে এবং সে কারণে স্বাভাবিকভাবে তাঁর লেখনী ধারণা করে বর্তমান সমাজের নগ্ন প্রতিচ্ছবি। বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে ইতিমধ্যে যা প্রকাশিত হয়ে গেছে তা ঔপন্যাসিকের মতে ভালো, প্রিয় এবং মনমোহক। তিনি উপলব্ধি করেন এবার কিছু এমন তথ্য উপন্যাসে গল্পে, কবিতায় উঠে আসা উচিত যা অপ্রিয় হলেও বাস্তব। কাজেই সত্তরের জলে বিভাজন লেখকের মনে দাগ কাটে। সাহিত্য যে এবার নতুন মোড়ে পা দিতে চলল তা দেবেশ উপলব্ধি করতে পারেন। সাহিত্যে গল্পে কবিতায় নগ্ন বাস্তবের ছোঁয়া সাহিত্যিককে রোমাঞ্চিত করে। বাস্তবকে জানার আগ্রহ দিনের পর দিন তাঁর বাড়তেই থাকে। এই ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঔপন্যাসিক দেবেশ কেবল পারিপার্শ্বিক কারণেই বাস্তবকে কল্পনা করার ইচ্ছা গ্রহণ করেননি। একেবারে ছোটোবেলা থেকেই বাস্তবিক তথ্য সংগ্রহ করা তার অভ্যেস ছিল যে কারণে সাংবাদিকতা তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। সাংবাদিকতার পেশা নির্বাহ করতে করতে সাহিত্যিক দেবেশ আবিষ্কার করেন সংবাদ ও আখ্যান সাহিত্যের মধ্যে এক লেনদেনের সম্পর্ক।

সেই সম্পর্ককে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেন—

> ‘‘সাংবাদিকতার কাজ তথ্য নিয়ে, গল্প উপন্যাসের কাজও তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরি করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প উপন্যাসে তথ্যের একটা মানবদলিল নির্মাণ করা যায়। ... যে সাংবাদিকতা চলমান ইতিহাসের আধার, তার কাছ থেকে আখ্যান সাহিত্যের গ্রহণ করার আছে অনেক। ... সাংবাদিকতার দৈনন্দিনকে প্রত্যাখ্যান, করেই কোনো লেখক তৈরি করে তুলেছেন তাঁর বিমূর্ত আখ্যান সেখানে শব্দতার নতুন অর্থের সঙ্গে অন্বিত হয় নতুন বাগ্বিধিতে।’’[১]

সংবাদ আর আখ্যানের সম্পর্ক যখন এতই আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো তখন সত্যিকারের সাংবাদিকের ভিতরে এক বাস্তববাদী সাহিত্যিক লুকিয়ে থাকতে বাধ্য। ঔপন্যাসিক দেবেশের কাছে সাহিত্য আর সংবাদের মাঝখানের সীমারেখাটি অবচেতনে থেকে যায় এবং এক গুপ্ত রহস্যের মতই আখ্যানের ভিতর সংবাদ সঞ্চারিত হয়। সংবাদ পত্র থেকে সংগৃহীত বহু তথ্য তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই আখ্যানের রূপ ধারণ করে। ফলে বহু তথ্য কেবল দৈনন্দিন সংবাদপত্রের স্বল্পায়ুতে প্রাণ হারায়নি। আজও দেবেশ রায়ের আখ্যানের মাধমে সেই তথ্যগুলো জীবিত প্রাণবন্ত। সেই সূত্র ধরেই তাঁর সাহিত্যভুবনকে তিনি কেবল বঙ্গভূমিতেই সীমিত রেখে দেননি। ভারতবর্ষের আনাচে কানাচের তথ্যগুলি উঠে এসেছে তাঁর কথাবিশ্বে। আসাম গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের কাহিনি শুনতে পাওয়া যায় দেবেশ রায়ের গল্প উপন্যাসে। যেখানেই রূঢ় আধুনিকতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের লড়াই সেখানেই দেবেশের লেখনী উদ্যত হয়ে উঠে। তাছাড়া দেবেশের গল্প উপন্যাস একঘেয়েমি বিরোধী। বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন কাহিনি ও বাস্তবতাকে পেশ করতে দেখা যায় ঔপন্যাসিক দেবেশকে। সাহিত্যিক দেবেশ এইভাবেই তাঁর সাহিত্যভুবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের দেশ থেকে চলে গেলেও ঔপনিবেশিক মোহ যে আমরা ত্যাগ করতে পারিনি তা ইতিমধ্যে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর সেই সাথে প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে ইউরোপীয় মডেলের আমদানী ও বিদায়। ঔপন্যাসিক দেবেশকে তৎকালীন সাহিত্য বেদনাদায়ে বিদ্ধ করে। তিনি নিজস্ব সাহিত্য জগৎ সৃষ্টিতে কারও হস্তক্ষেপ স্বীকার করেননি। নিজস্ব ভাষা নিজস্ব রীতিই তাঁকে বিকল্প লেখক হিসেবে পরিচিত করে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত উদ্ধৃত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

> ''দেবেশের যেটা 'এজ' সেটা ওঁর ভাষাতে। ... দেবেশের লেখার মধ্যে অসংখ্য ভাষা আছে। ... দেবেশের ভাষা আছে। আধুনিক ভাষা।''[২]

আধুনিকতাকে বরণ করেন দেবেশ তবে আধুনিকতার স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি তীব্র ঘৃণা করেন। তাঁর প্রতিবাদমুখর বৃত্তান্ত প্রতিবেদনগুলো এরই পরিচয় বহন করে। আধুনিকতা মানে যে স্বকীয়তা বর্জন করে পরকীয়তা গ্রহণ করা, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না নিজের দেশেই যখন রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ তখন অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়ার কোনো মানে থাকে না। দেবেশ রায় শুনেছেন প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিকরা নাকি এই সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন তাই তাদের রচিত সাহিত্য যেন ঢাকাই মসলিনের সুতো। কিন্তু আধুনিক ভারত সেই সম্পদের রক্ষা করতে পারেনি। কারণ সাহিত্য—

> ''এর ভিতর ভীষণ অবান্তর হাওয়া আসে।
>
> রিয়ালিজম, ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম, সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম, স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট-স্টাকচারালিজম, মডানির্জম, পোস্ট মজানির্জম, পোস্টা কলোনিয়ালিজম, ম্যাজিক রিয়্যালিজম—এই সব হাওয়া, গল্প উপন্যাসের পক্ষে এমন মারক আর হয় না, যেখানে মাটি এ গাঁয়ের, সার এ গাঁয়ের, জল এ গাঁয়ের,

বিছন এ গাঁয়ের, চারা এ গাঁয়ের অথচ গাছ ফলন্ত হওয়ার জন্যে যে হাওয়াটা দরকার সেটাই শুধু বাইরে থেকে আসবে।"[৩]

ঔপন্যাসিক দেবেশ যখন প্রকাশ্যে সমস্ত 'ইজম'কে অবান্তর বলে ঘোষণা করতে পারেন তখন তাঁকে প্রতিস্পর্ধী লেখক ছাড়া অন্যকিছু বলা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন এই 'ইজম' গুলোর সূত্র ধরে কখনও উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যদিকে তিনি দেখেছেন ইউরোপীয় সাহিত্যে রিয়্যালিজম যতটা গভীর ও যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে বঙ্গ সাহিত্যে ততটা হয়নি। কারণ আধুনিক ভারত নিজস্বতাকে হারিয়ে পরকীয়াকে বরণ করতে সদাই ব্যস্ত। তাই নিজের বাস্তবগুলোতো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল। ঔপন্যাসিক সেই বাস্তবকে জানার তাগিদেই গল্প উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। আলোচ্য অধ্যায়ে দেবেশ রায়ের কথন বিশ্বের সাধারণ পরিচয় আলোচিত হবে যার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের বিকল্প চিন্তাধারা ও মানবজীবনের বাস্তবতা আসবে।

ঔপন্যাসিক দেবেশ প্রচলিত ধারণাকে অবহেলা করে নিজের কথাবিশ্বকে ব্যতিক্রমী চিন্তা চেতনার দ্বারা পরিপুষ্ট করে তোলেন। চারটি প্রতিবেদনমূলক ও চারটি বৃত্তান্তমূলক রচনা বাদ দিয়ে যদি আমরা বাকি উপন্যাস ও গল্পগুলিকে একটু খুটিয়ে পড়ি তবে এইগুলোতেও বাস্তব জীবনের গভীরতা ফুটে উঠতে দেখি। বলতে গেলে দেবেশ রায় রচিত প্রতিটি গল্প কিংবা উপন্যাসের ধরণগুলো তাদের নতুনত্ব দিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক একটি বিশিষ্ট দিক নির্ধারণ করছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সাধারণ থেকে অসাধারণের, নীচু থেকে উঁচু পর্যায়ের, গ্রাম থেকে শহরের ইত্যাদি মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেই পরিবর্তন হয়তো এমন এমন ভাবে ঘটতে পারে যা কোনো বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিংবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সভ্য সমাজকে বোঝানো রীতিমত চ্যালেঞ্জর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে প্রতিটি মানুষ যদি নিজের জীবন দিয়ে তাঁর রচনার সত্যতা প্রমাণ করতে চায় তবে পাঠক সমাজে পাঠবোধের সার্থকতা অবশ্যই মিলবে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে কোনো কোনো সময় দেখা যায় যা

অহরহ ঘটে চলেছে তাকেই এক অনন্যভঙ্গীতে প্রকাশ করতে। যা সত্য, যা নিত্য ঘটনা তাকে ঘিরে যে জনগোষ্ঠী রয়েছে, সেই জনগোষ্ঠীর অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির ফলে প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া, সেই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেবেশ রায় তার হস্ত নিপুনতায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। আবার কখনও সম্পর্কের জটিলতা তাঁর উপন্যাসে এমন ভাবে ধরা দিয়েছে যে তাকে অস্বীকার করতে চাইলেও করা যায় না। আর ঠিক এখানেই দেবেশ রায় তাঁর রচনায় প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণ করে নিয়েছেন।

দেবেশ রায়ের কথনবিশ্বে গল্পসমগ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলো বিশাল ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে এই গল্পগুলোর এক আধটু উল্লেখ না করলে তাই বিষয়ের অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা থাকে। গল্প বা উপন্যাস দেবেশের কাছে কীভাবে ধরা দেয় তার আন্দাজ করা যায় গল্প সমগ্রের গল্পগুলিতে। ঔপন্যাসিকের মতে গল্প কিংবা উপন্যাসের কোনো নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই। ছোট গল্প, গল্প, উপন্যাসের পূর্ব নির্ধারিত সংজ্ঞা বর্তমান সময়ে আর প্রযোজ্য নয়। কারণ সমস্ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে আপন বেগে বয়ে চলছে বর্তমান বঙ্গসাহিত্য। এই প্রসঙ্গটি দেবেশের উক্তিতে আরও বেশি স্পষ্ট করা যায়—

> ‘‘যে কোনো রকম সংজ্ঞা থেকে উপন্যাস নিজেকে এমন ছাড়িয়ে নিয়েছে যে সে প্রায় লঙ্কায় হনুমানের মত বাঁধলে বাঁধন ছাড়িয়ে যায় এতই বড়, বাঁধলে বাঁধন এড়িয়ে যায় এতই ছোট, বা জল থেকে তোলা বোয়াল মাছের মত, হাত দিয়ে ধরতে গেলে লেজের একঝাপটে পিছলে জলে ফিরে যায়।’’[৪]

এইরকমই সমস্ত বাঁধন হারিয়ে দেবেশে রায়ের ছোট গল্পগুলো পাঠক মণ্ডলীর সম্মুখে পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন রূপ নিয়ে ছোটগল্পগুলো আপন আকৃতি ধারণ করে সাহিত্যিক দেবেশ তাঁর ছোটগল্পগুলো রচনা করতে গিয়ে এমন একজন লেখকের পরিচয় দিয়েছেন যিনি তাঁর কথাবিশ্বকে সমাজের সমস্ত খুঁটিনাটি

দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন। পাঠক সমাজকে তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন এমন উপহার দিয়েছেন যা হয়তো পাঠক সমাজ প্রথম পঠনে কিংবা সাধারণ মনোভাবনায় মেনে নাও নিতে পারে। কিন্তু যদি এই পাঠকই বাস্তব জীবনকে অনুসরণ করে গল্পগুলো দেখেন তবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে তার আর কোনও অসুবিধা হবে না। অত্যন্ত কম কথায় সাহিত্যিক দেবেশ সাহিত্য সমাজকে আলোড়িত করতে পেরেছেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও পাঠকের মনে চিন্তাচেতনার সূত্রপাত ঘটানোর জন্য মুক্ত জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। গল্প সমগ্রের প্রতিটি খণ্ড এরই পরিচয় বহন করে। দেবেশের রায়ের প্রতিটি ছোট গল্প এক অভিনব চিন্তাচেতনার পরিচয় বহন করে। অত্যন্ত সাধারণ পাঠকও গল্পের শেষে নিজের অজান্তেই চিন্তা চেতনার একটা মুক্ত পরিসর তৈরি করে নিচ্ছে। এতে দেবেশ রায়ের কথা বিশ্বে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়টি পাঠক সমাজের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না। তিনি তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত দিকগুলোর সাহায্য নিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে কতরকম ভাবে ব্যবহার করা যায় তা দেবেশে রায়ের রচনা না পড়লে বোঝা যাবে না। যে কোনও পরিস্থিতিতে যে রাজনীতির প্রবেশ ঘটতে পারে তা তাঁর উল্লেখিত উক্তির ইঙ্গিতে বোঝা যায়,

> ‘‘স্যানাটেরিয়াম থেকে ফেরা পারিবারিকতায়, বা মফস্বল স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে ট্রেনের ছুটে যাওয়ায় বা উদ্বাস্তু কলোনির জীবনযাপনে বা মফস্বলি কোনও রেলস্টেশনের দুর্ঘটনায় ৬২ সাল পর্যন্ত আমাকে বারবার ফিরতে হয়েছে আমার স্বপ্নে, কল্পনায়, রাজনীতিতে।’’[৫]

দেবেশ রায়ের উক্তি থেকে এও জানা যায় রাজনীতির সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই কোনও না কোনও কারণে তিনি জড়িয়ে পড়তেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপে তিনি জলপাইগুড়ির সঙ্গে সেসময় মিশে গিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির গ্রাম, রাজবংশী মানুষ,

সেই মানুষদের বার্তালাপ, তাদের প্রকৃতি, তিস্তা নদী, চা-বাগান, বাগানের শ্রমিক, ফরেস্টের গাছ-পালা-জঙ্গল-পশুপাখি, ফরেস্টের লোকজন, তাদের ব্যস্ততা, তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা, তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই জলপাইগুড়ির সাথে মিশে গিয়েই তিনি তাঁর মুক্তির পথ খুঁজে পান। তবে তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্ন কল্পনাকে বাস্তব রূপদান করতে গিয়ে তাঁর গল্প উপন্যাসগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছিল কিনা তার উত্তর খুঁজে বার করার জন্য তিনি পাঠক সমাজের সামনে খোলা জায়গা ছেড়ে দিলেন। আলোচনার শেষে পাঠক সমাজ হয়তো তাদের উত্তরের ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন।

গল্পসমগ্রের প্রতিটি খণ্ডে দেবেশ রায় সমাজের বিভিন্ন দিকগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। গল্পসমগ্রের প্রতিটি গল্পে এক অভিনব ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ কাহিনির মধ্য দিয়ে এক অন্যরকমের চিন্তা চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখি আমরা। প্রতিটি গল্প একঘেয়েমির ধার না ধরে আপন আপন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। সমাজের নগ্ন বাস্তবের সঙ্গে রহস্যমূলক কাহিনির পরিচয়ও মেলে দেবেশের ছোট গল্পগুলোতে তাঁর ভিন্নতা ও বিশিষ্টতাকে কোন কিছুর সাথেই তুলনা করার জন্য বেঁধে রাখা যায় না। তাইতো সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বলেছেন—

> ‘‘প্রাচীন, আধুনিক, আঞ্চলিক—সর্বজনীন কোনো অভিধা বা ‘লেবেল’ এর মধ্যেই দেবেশ রায়কে আটকে রাখা যায় না। তবু তাঁর ছোটগল্পগুলি ঐ সাহিত্যধারার সেরা নমুনার মধ্যে পড়ে।’’[৬]

উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত ‘উদ্বাস্তু’ ছোটগল্পটিতে গল্পকারের নিজস্ব কথন স্বল্প মাত্রায় সীমিত, অধিকাংশই ঘটনার তথ্যগুলোর প্রকাশ। পাঠকমণ্ডলী তথ্যপাঠে উদ্বাস্তু সমস্যার ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে অবশ্যই জানবেন তবে লেখকের সীমিত বাক্যের প্রয়োগে তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পারবেন এই সমস্যার পরিণতি সম্পর্কে। সর্বস্বহারা উদ্বাস্তু সমস্যা আজ দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এক বিশাল অংশের

উদ্বাস্তুরা যে কোনোভাবেই সরকারের সাহায্য কামনা করতে না পারে তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে। ম্যাগাজিন সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, মিডিয়া প্রভৃতিরা যতই উদ্বাস্তু সমস্যাকে এক জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে সকলের সম্মুখে প্রস্তুত করুক না কেন তাতে লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। কারণ খণ্ডিত ভারতবর্ষ এই সমস্যার সমাধান করতে অনিচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শুধু ভারতবর্ষেই নয় সীমান্ত দেশগুলোতেই একই অবস্থা। বর্তমানের টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলো একই নজির বহন করছে। উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে জড়িয়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির লোকের উপর অত্যাচারতো হচ্ছেই এমন কী নিজের দেশের লোকের অস্তিত্বকেও সংকটাপন্ন হতে হয়। যে কারণে বর্তমান ভারতে ডি ভোটারের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 'উদ্বাস্তু' ছোটগল্পটি তো সেই সমস্ত সমস্যাকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বল্পায়তন বিশিষ্ট একটি কাহিনি। একদিনের একটি ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সারাজীবনের অস্তিত্ব নিয়ে এতে টান পড়েছে।

শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী প্রতিদিনের মত সেদিনও বিলাসী ভূমিকায় বিছানায় শুয়েছিলেন। যদিও তার পোশাক আসাক, বিছানা পত্র সাধারণ থেকেও নিম্ন পর্যায়ের তথাপি তার মনে একটা সন্তুষ্টি ছিল যে তার নিজের ক্ষমতায় আজ সংসার পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্য যে দরজায় নক করছে তা সেসময় বিলাসী সত্যব্রত টেরও পাননি। থানা থেকে আগত দুজন ব্যক্তি সেই দুর্ভাগ্যের আভাস তাকে দেয়। কাহিনির শুরুতে সত্য ব্রত লাহিড়ী আগত দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত না পেলেও গল্পকার পাঠক মণ্ডলীকে এর ইঙ্গিত অবশ্যই দিয়েছেন। সত্যব্রত লাহিড়ীর দৈনন্দিন যাত্রা কাহিনি বর্ণনার শুরুতেই এর প্রকাশ—

> ''নিঃসংশয়ে তারই সে স্ত্রী, সেই মহিলা সত্যব্রতকে এসে
> ডাকাডাকি করছিল, শুনছ, এই শুনছ, এই।''[৭]

'নিঃসংশয়ে' শব্দটি প্রয়োগ করে একদিকে যেমন সেই মহিলাকে সত্যব্রতের স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত করান অন্যদিকে তেমনি এক না বলা কথার ইঙ্গিত ঘোষণা করেন। থানার লোক দুটি কর্তাকে বার্তা দিয়ে যান যে সেদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে

হবে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের দায়ে। সত্যব্রত লাহিড়ী যে সত্যব্রত লাহিড়ীই তা প্রমাণ করতে হবে নিজে সত্যব্রত লাহিড়ীকে। যখন কোন ব্যক্তির কাছে 'আমি'-র অস্তিত্ব সংকটাপন্ন তখন তার পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়ার পরিস্থিতি দাঁড়ায়। সত্যব্রত লাহিড়ীরও একই অবস্থা হয়। তারপর থানায় যে বিবরণ তার সামনে পেশ করা হয় তাতে তার সমস্ত জীবনের সব পরিশ্রম, চেষ্টা ইত্যাদি সব কিছু মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত সংক্ষেপে সেই বিবরণের মূল বিষয় উপস্থাপনা করার চেষ্টা করছি—

সত্যব্রত লাহিড়ীর সঠিক পরিচয় সরকারের খাতায় নেই। যে পরিচয় খাতায় রয়েছে তাতে একাধিক সত্যব্রতকে দেখা যায়। তাই সত্যব্রত লাহিড়ী যে সত্যব্রত লাহিড়ীই তার প্রমাণ সরকারের কাছে দেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সত্যব্রত লাহিড়ীর একাধিক পরিচয়—

১। কিছু কিছু তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী নামক কোনো ব্যক্তি বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০/এ/৬ নং হোল্ডিঙস্থ মোকামের মালিক।

২। অন্যকিছু তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.পাশ করেছিলেন, কিন্তু পর বৎসরই তিনি খুলনা যাবার পথে ট্রেনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহন হন।

৩। যাবতীয় তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় মোট সাতাশি জন সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৪৭ সালের পর বিবাহ করেন।

সুতরাং সংগৃহীত তথ্য নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি করে—

> "১) মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি.এ. খুলনা টেন আক্রমণে নিহত বলে ধরে নেওয়া কি অযৌক্তিক? অর্থাৎ মৌলিক সত্যব্রত জীবিত হওয়া সত্ত্বেও কি তাকে মৃত বলে ধরা হচ্ছে?

২) যদি মৌলিক সত্যব্রতের সত্য সত্যই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তার পরিচয় কে কে আত্মসাৎ করেছে।”[৮]

উল্লেখিত তথ্যগুলোতে আর কিছু প্রমাণিত হোক বা না হোক সত্যব্রত লাহিড়ী যে নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না তা তার তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতিতেই প্রমাণিত হয়। সকালেই যার আত্মা এক পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল সেই ব্যক্তিই তার নিজের সঠিক পরিচয় না পেয়ে সর্বস্বহারায় পরিণত হয়। তারপর এখানেই আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণি সাধারণ ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দেননি। রিক্তকে আরও রিক্ত না করা পর্যন্ত তাদের চক্রান্ত থামে না। তাই এবার শুরু হল সত্যব্রত লাহিড়ীর স্ত্রী অনিমা সান্যালের সঠিক পরিচয়ের তত্ত্বাবধান।

অনিমা সান্যালের বেশ কয়েকটি পরিচয় পাওয়া যায় সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে। এক, ৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অনিমার পরিবারের লোকেরা ভারতবর্ষে চলে আসলেও এনামূলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ও বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য অণিমা সেখানে থেকে যায়। এনামূল ও অনিমার বিয়ের সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। পরে অনিমা গর্ভবতী হওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য ভারতে আসালেন সেখানে একপ্রকার জোর করেই তাকে সত্যব্রত লাহিড়ীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। দুই, পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমস্ত হিন্দুজাতি যখন আতঙ্কিত তখন প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে অনিমার পরিবার এনামূলের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অনিমার শরীরের প্রতি এক লোভ লালসা এনামূলের মনে কাজ করছিল। তাই পরিবারের বাকীরা ভারতবর্ষে চলে আসলেও অনিমাকে জোর করে সেখানে রাখা হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি অনিমাকে ধর্মান্তরিত করে নাম পরিবর্তিত করা হয়। নতুন নাম ‘কুমকুম’ বানিয়ে অনিমার সঙ্গে এনামূলের বিবাহ হয়। তবে এই কুমকুম ওরফে অনিমা কবে ভারতবর্ষে আসে তা জানা যায় না। তিন, ২৩০/এ/৬ নং মোকামে স্বামী স্ত্রী রূপে যে সত্যব্রত ও অনিমা দশ বৎসর ধরে বাস করছিল তাদের ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই মার্চ বল্লভপুর সদর হাসপাতালে এক সন্তানের

জন্ম হয়। সেখানে অনিমার ভর্তি হওয়ার পাঁচদিন পরেই সে মারা যায়।

উল্লেখিত তথ্যগুলো যখন সত্যব্রত লাহিড়ীর সামনে পেশ করা হয় তখন অস্তিত্বহীন সত্যব্রত লাহিড়ীর কাছে পৃথিবীর সমস্ত কিছু মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সত্যব্রত লাহিড়ী তাঁর পরিপূর্ণতা হারিয়ে নিঃস্বতে পরিণত হয়। জীবনের সর্বাধিক অভিজ্ঞতায় সে যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বয়জ্যাষ্ঠতে পরিণত হয়। সরকারের ব্যক্ত করা কতগুলো কথা সত্যব্রত লাহিড়ীকে এই অবস্থায় পরিণত করে—

> ‘‘যতদিন এই সোজাসুজি প্রশ্ন চারটির সত্য জবাব পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন যাঁকে আপনি স্ত্রী বলে জানেন, তিনি আপনার স্ত্রী নন; যাকে আপনাদের সন্তান বলে জানেন, সে আপনাদের সন্তান নয়।
>
> সুতরাং নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয়সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করুণ আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।’’[৯]

সর্বস্বহারা সত্যব্রত যখন সারাদিন থানায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন বাড়ির পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপ তার মনের অবস্থাই বর্ণনা করেছিল। লেখকের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে এই পরিস্থিতি যেন পাঠকের সম্মুখে এক চিত্রকল্পের রূপ ধারণ করেছে। সূর্যাস্তের পর সমগ্র পৃথিবী যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় সেদিন অনিমা ও সত্যব্রতর জীবনেও চির অন্ধকার নেমে আসে, সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি আত্মা একই সঙ্গে একই গৃহে একই বারান্দায় এক অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে রইল, সে মৃত্যুর ক্রিয়াকার্য সম্পন্ন হবে তাদের নিজের কিংবা অন্য কোনও ব্যক্তির সন্তান অঞ্জুর মাধ্যমে। উদ্বাস্তু সমস্যা বুর্জোয়া শ্রেণির তৈরি করা এমন এক সমস্যা যা স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও সমাধান করা যায়নি। কারণ এই জ্বলন্ত সমস্যায় অনবরত ঘি ঢেলে যাচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণি। সর্বস্বহারা এই উদ্বাস্তুদের নিয়ে যেমন খুশি তেমন খেলা চলছে প্রতি মুহূর্তে। এই

খেলা কখনও কার্যকরী হয় পরিচয় পত্র দানের মধ্য দিয়ে আবার কখনও কার্যকরী হয় কৃষিউৎপাদনের মধ্য দিয়ে। যে কোনভাবেই অস্তিত্বের সাথে সাথে খুব শীঘ্রই তাদের আত্মবলিদানও দিতে হয়। এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত আরও একটি গল্প 'রাষ্ট্রপতির শাসনে'-এ দেখা যায় দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাঝখানে এসেই এক উদ্বাস্তু তার প্রাণ হারায়। শোষণের তীব্র প্রতিবাদ করার চেষ্টা সে তার মৃত্যুর পরও ছাড়েনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাদের পিছ ছাড়তে নারাজ। তাই মৃত্যুর পরও সেই ব্যক্তি আপন পরিচয় লাভ করতে পারেনি।

ব্যবসায়ী নিবারণ বাবুও চা কোম্পানির ডিরেক্টর বাবু পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন। বিত্তবান দুজনের মধ্যেই প্রতিযোগীতার জেতার হিংসা বিরাজমান। পরস্পর বিরোধী এই দুই বাড়ির মাঝখানে যখন এক পরিচয়হীন ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায় তখন বিরোধী দল হলেও দুজনের মতামত এক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি এরাও হতে পারে। মৃত্যুদেহের খবর পেয়ে যখন এক অচেনা অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা পরিধান করা এক মহিলা এসে মৃতদেহকে তার স্বামী হিসেবে দাবী করে তখন গল্পটি এক নতুন মোড় নেয়। এই নতুন মোড়েই লুকিয়ে রয়েছে লেখকের প্রয়াস। মৃতদেহের জীবনকালের কাহিনি বর্ণনায় সেই প্রয়াসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তিস্তার চরে বসবাসকারী লোকদের মধ্যেই একজন ছিল রামগোপাল। সরকারের খাতায় এই চরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি নেই কারণ এখানে বসবাসকরা আইনসঙ্গত নয়। অশিক্ষিত নিরীহ এই ব্যক্তিগুলো আইনের প্যাঁচ বোঝে না কিংবা বুঝেও এই প্যাঁচগুলোকে অস্বীকার করে। সামান্য একটু জায়গায় চাষ করে ফসল উৎপাদন করে তারা কেবল জীবন অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু জীবন তো এত সহজ নয়। তার উপর যখন পরিচয়হীন হওয়ার প্রসঙ্গ আসে তখন রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো এক দুর্বল প্রাণীর কথাই মনে আসে, যাকে আকাশে উড়ন্ত ছিল শকুনরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। উপেন দাশ নামক শহরে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে থাকা এক ভারতীয় নাগরিক চরের বেআইনী জায়গা বেশ অনেকটা জমি দখল করে বর্গাদার দিয়ে চাষ করায় চাষ করাতে তার

যতটুকু ইচ্ছা প্রকাশ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি ইচ্ছা দেখা যায় চরের জমিতে উৎপাদিত অন্যের ফসল কেড়ে নিতে। যে বছর সে কৃষকের ফসল অধিকমাত্রায় উৎপাদিত হয় সেই বৎসর সেই কৃষককেই আইনের মার প্যাঁচে পড়তে হয় উপেন দাশের কর্মচারীরা রায় গোপালকে ছলে বলে কৌশলে সেখান থেকে সরিয়ে আহত করে হাসপাতালে ভর্তি করে কিংবা মেরে ফেলে কিংবা অন্য কিছু করে তার জমির সমস্ত ধান আত্মসাৎ করে। আর এই কাজে কোনো আইনের হস্তক্ষেপও হবে না কারণ সরকারের খাতায় তিস্তার চরে কোনো মানুষ নেই। তাই মৃত ব্যক্তি মরেও অস্তিত্বহীন।

এই মৃতদেহ নিয়ে যখন সরকারী মামলা হল তখন মৃত ব্যক্তি কীভাবে মরল তার চেয়ে বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়াল মৃতব্যক্তিকে নিবারণবাবু ও ডিরেক্টর বাবুর বাড়ির মাঝখানে কে আনল। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটানোর সাহস কার হলো। মাননীয় সরকার এই খানেই উদ্বাস্তুদের রেহাই দেননি। এক সপ্তাহ পুরনো পচাগলা মৃতদেহকে যখন খেকমনি ওরফে খেকি এসে নিজের স্বামী বলে দাবী করে তখন রামগোপাল মরেও নিজের পরিচয় লাভ করতে পারল না। উপেনদাশের চক্রান্তে রামধন নামক আরেক ব্যক্তি খেকমনির স্বামী হিসেবে হাজিরা দেয়। গতিকেই আর কোনো মামলাই রইল না কারণ খেকমনি ওরফে খেকির স্বামী জীবিত। চরে আর কোনো ব্যক্তির মৃত্যুও হয়নি। সুতরাং মামলা একরকম খালাস। আর লেট্রিনের সোকপিটে পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহটি কুকুর বেড়ালের মৃতদেহের সমান। তাই নিবারণ বাবুও ডিরেক্টর বাবু নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, মিউনিসিপ্যালিটির লোক কিছু সময় পর এসে এই আবর্জনা পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে। অকথ্য এই কথনগুলো যেন কাহিনির ক্রমাগত ধারায় আন্দাজ করা যায়।

স্বাধীন ভারতে যদি প্রতিদিন সর্বত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে তবে সেইদিন আর দূর নয় যেদিন রাষ্ট্রপতির শাসনাধিন ভারতবর্ষের পবিত্র সংবিধান পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের রক্তে রঞ্জিত হবে এবং সংবিধান অপবিত্র হল সেই খুনীদেরপাপে যারা প্রতিদিন কোনো না কোনো ভাবে নিম্নবর্গীয়দের শোষণ করে যায়। পাঠকমণ্ডলীকে লেখক এই

বাস্তবতার সম্মুখীন করিয়েই মুক্তি দিয়ে দেননি কারণ এর পর যে অপ্রিয় বাস্তবতার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাতে পাঠকমণ্ডলীও রেহাই পান না। অর্থাৎ সমাজের অহরহ এই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ যারা করছে না তারাও একই পাপে দূষিত, তারাও এক অর্থে খুনি। তারাও হয়তো কোনোদিন সোকপিটে মৃতদেহ হিসেবে পড়ে থাকতে পারে, হয়তো তারাও উপেন দাশের মত খুনি হিসেবে পরিচিত হতে পারে।

সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী গল্প 'শরীরের রকমফের' যেখানে উদ্বাস্তু সমস্যা বা নিম্ন বর্গীয়রা উঠে আসেনি। এখানে লেখক যেমন এক বাস্তববোধের সম্মুখীন পাঠকমণ্ডলীকে করিয়েছেন তেমনি এক না বলা কথাকে আপন ভাষাও দিয়েছেন।

নারী যুগ যুগ ধরেই পুরুষের কাছে এক রহস্যময় সামগ্রী হিসেবে পরিচিত। নারীর শরীর যে কতরকম ভাবে কত পুরুষই না বর্ণনা করেছেন তার সঠিক হিসেব বের করা কঠিন। নারীর শারীরিক সৌন্দর্য যেমন পুরুষকে মোহিত করেছে তেমনি নারীর বিলুপ্ত সৌন্দর্য পুরুষকে অনেক দূরেও ঠেলে দিয়েছে। নারীর পরিবর্তিত রূপ সময়ে সময়ে পুরুষের ভাবনাকে পাল্টে দিয়েছে। যে পুরুষ লেখক হিসেবে পরিচিত সে এই পরিবর্তিত রূপগুলোকে ভাষা দিয়েছে আবার যে পুরুষ তার ভাবনাকে ভাষা দিতে অক্ষম সেও এই পরিবর্তিত রূপগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে নারীর শরীর প্রতিটি পুরুষের কাছেই রহস্যময়ী এক পরিবর্তিত ধারা। ক্রমবর্ধিত বয়স নারীর শরীরকে কবে কীভাবে কীরূপ দান করে তা দেখার লালসা প্রতিটি পুরুষের মনেই লুকিয়ে থাকে। আবার সেই লালসাই বিতৃষ্ণায় পরিণত হতে পারে যখন নারী তার যৌবনতার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। নিজের আকর্ষণ ধরে রাখার তখন নারীর হাজার চেষ্টা। প্রকৃতির স্বচ্ছ নিয়মগুলো সহজেই পুরুষ কিংবা নারীর মনে ধরা না দিলেও শরীরে অবশ্যই ধরা দেয়। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া নারীর রূপ সকলের চোখেই ধরা দেয়।

শরীরের রকমকের ছোটগল্পটিতে যশোদানন্দন তার স্ত্রী-র শরীরের ক্রমপরিবর্তিত রূপের সাথে নিজের মনের গভীর যোগ লক্ষ্য করতে পারেন। স্ত্রী-র কাপড় চোপড়

থেকে প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে স্ত্রীর সাথে যশোদানন্দনের সমভূমিকা পালনে স্ত্রী-কে নবযৌবনের সাজে সজ্জিত করার চেষ্টা বিদ্যমান। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে তো আর অলঙ্ঘন করা যায় না। তাই বিবাহের তেরো চৌদ বছর পর দীপার অর্ধ নগ্নতা তাকে আর আগের মত উল্লাসিত করে না। যশোদা খেয়াল করতে পারে বিষয়টি, কাহিনির বর্ণনায় বিষয়টি স্পষ্ট। তবে যশোদার মনে উল্লাস বোধ না আসলেও নতুন এক ভালোলাগা আসে, যা তেরো চৌদ্দ বছর পূর্বের উল্লাস বোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যা ম্যাগাজিনের পাতায় ভাস্য তারকাদের মতই ভালোলাগা, এক অর্থহীন ভালোলাগা—

> ''দীপার এমন গার্হস্থ্য প্রায় নগ্নতা ত যশোদার কাছে নিরর্থক, তের-চৌদ্দ বছরের ঘনিষ্টতায় নিরর্থক। সে সবেই ত থাকে নগ্নতার প্রয়োজনটাকেই অস্বীকার। কিন্তু নিজের শরীর খুলে এতটা স্বাভাবিক ভঙ্গি যেন দীপার শরীরটাকে, এত চেনা শরীরটাকেই নতুন করে ভাল লাগিয়ে দেয়, অর্থহীন ভাল লাগিয়ে দেয়, 'ফিল্মফেয়ার'-এর পাতার ইংরেজিতে ছাপা অতি চেনা জিনিসপত্রের ও মেয়ে শরীরের মত ভাল লাগিয়ে দেয়।''[১০]

দীপার শরীরকে নবযৌবনের সাজে সজ্জিত করার চেষ্টায় যে নতুন ভালোলাগা যশোদা আবিষ্কার করে তাতে নব যৌবনের উল্লাসবোধ নেই ঠিকই তবে এতে রয়েছে বয়সের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা আপন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

অপরদিকে যশোদার এই মনোভাবনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনা পোষণ করে দীপার মনস্তাত্ত্বিক দিক। দীপার একমাত্র চেষ্টা সে যেন পৃথিবীর বাকী মেয়েদের ভিড়ে মিশে যেতে পারে। বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে মেয়েদের ভিড়ে সে কিছুতেই মিশে যেতে পারছিল না কেবলমাত্র ঐকিক চিহ্ন ধারণের অভাবে। দীপার প্রথম মনে হল সামান্য সুগন্ধির অভাবে সে মেয়েদের ভিড়ে মিশতে পারছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেও আবিষ্কার করতে পারে আসলে সে কি এই ভিড়ে মিশে যেতে চাইছে না নিজেকে

আলাদা করতে চাইছে। দীপা লক্ষ্য করে বিয়েবাড়ির বাকী মেয়েদের থেকে সে কতটা পৃথক। নিজের অপরিপূর্ণতা দীপাকে আরও গুটিয়ে আনতে চায়। সারা সন্ধ্যে সাজার পরও কত ত্রুটি এখন ভাস্যমান। মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত আরও অনেক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন ছিল। এখন সেই অপরিপূর্ণতাই তাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আরও গুটিয়ে আনবে এই আশঙ্কটায় দীপার মন শঙ্কিত। গল্পকার দীপার মধ্য দিয়ে হয়তো ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি মেয়ের শঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। নিজের স্বামীর কাছে নিজের শরীর কী হিসেবে ধরা দিচ্ছে তা নিয়ে এক অসুরক্ষার অনুভূতি তো প্রতিটি নারীর মনের কথাই কিন্তু আগত ভবিষ্যতকে ঠেকানো যাবে না কিংবা অনেকটা পিছিয়ে ফেলে আসা যৌবনেও আর ফিরে যাওয়া যাবে না। ব্যর্থ চেষ্টাতেই জীবন কাটাতে হবে একথাও ভাবা যায় না। লেখকের সুনিপুণ বর্ণনাতে দীপার মনোভাবনা স্পষ্ট—

> ‘‘নিজের শরীর নিয়ে ভবিষ্যতের সেই অনিশ্চয়তার সামনে দীপার সারাটা শরীর শরীরের নিয়মেই আত্মরক্ষায় গুটিয়ে যেতে চায় কিন্তু এই ভিড়ের ভিতর নিজের কাছেই নিজে এমন আলাদা হওয়ার কঠিন মুহূর্তটিকে দীপা টের পেয়ে যায়, অঙ্গচ্ছেদের বেদনাতেই টের পেয়ে যায় যে তার মাথার চুল, কপাল, চোখ, ঠোঁট, গলা, ঘাড়, বুক, পেট, কোমর, উরু, পা, পায়ের পাতা সব আলাদা আলাদা হতে শুরু করল। তার আর পেছুবার উপায় নেই। নিশ্চিত ভবিষ্যতে এই ভিড়ে মিশে যাবার আগে এখন যেন তার একটু আড়াল চাই, নিজেকে নিজে দেখবার জন্যে একটু আড়াল।”[১১]

অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে দীপা বিয়েবাড়ির ভিড়ের মধ্যে কেমন একা হয়ে যায়।

দেবেশ রায়ের তিনটি ভিন্ন ধর্মী ছোটগল্প আলোচনার পর আগামী নির্বাচিত গল্পের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে বর্তমান শতকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা নারীচেতনাবাদ নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন আছে, যদিও নারীচেতনা নিয়ে বহুবার বহুভাবে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে তথাপি নতুন কিছু আলোচনা না করে চর্চিত বিষয়গুলোকে এখানে আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় পাঠক মণ্ডলী ছোটগল্পটির একটি বিশেষ দিক থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। মানবজাতির অর্ধেক শতাংশ প্রাণের অধিকারী নারীজাতিকে চিরকাল ধরেই সর্বত্র অবমাননা করা হয়েছে যে নারী মানবজাতির সৃষ্টিদাতা সে নারীকে অপমান করার কোনো অবকাশ পিতৃতন্ত্র ছাড়েনি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয় হলো এত অত্যাচারের পর অপমানের পরও নারী আগে নিজের আত্মসম্মান প্রকাশ সম্পর্কে কোনোদিন কিছু ভাবেনি। অপমান চরম পর্যায়ে গেলে এর প্রতিবাদ করার সুপ্ত ইচ্ছা অবচেতনে থাকলেও তার প্রকাশ ঘটেনি কেবলমাত্র ভাষার অভাবে। একুশ শতক নারী জাতিকে সেই ভাষা দিয়েছে সেই সঙ্গে দিয়েছে প্রতিবাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা। নারী তার মনের কথা বলার জায়গা তৈরি করে নিয়েছে বিশেষ করে চেতনাবাদের মাধ্যমে সাহিত্যে যখন নারীর মনের কথা ব্যক্ত হচ্ছে তখন নারী কী করে আর শোষিত হতে পারে। নারীচেতনাবাদের হুংকার আজ চর্তুদিকে ধ্বনিত কয়েকজন তাত্ত্বিকের ব্যবহৃত উক্তিগুলোর উল্লেখ বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হবে—

> "১। কেট মিলেটের Sexual Politcs (১৯৬৯) বইটি সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্পর্কে উদ্‌ভাসনী আলোকপাত করার পরে নারীর ভাবমূর্তি নামক অলীক নির্মিত যেমন স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তেমনি সামাজিক প্রতাপের কৃৎকৌশলও উলঙ্গ হয়ে যায়।
>
> ২। যে লৈঙ্গিক পরিচয় নারীর যৌন লাঞ্ছনার কারণ ছিল ধীরে ধীরে তা-ই হয়ে ওঠে স্বাধীন অস্তিত্ব

উদ্‌যাপনের আকর।

৩। নারীচেতনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমস্ত পূর্বাগত ধ্যানধারণার অভ্যস্ত পিঞ্জরকে ভেঙে দিয়ে আর, এই ক্রমিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে নারীর স্বতন্ত্র জীবনানুধ্যান, স্বাধীন প্রতিবেদন।"[১২]

নারীজীবনের তিনটি ভিন্ন দিক নারীচেতনাবাদ থেকে নেওয়ার অর্থ হলো নারীর স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে বর্তমানে খুব বেশি কষ্টকর ব্যাপার নয় তাই বোঝানো। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করবেন যে নারী কি সত্যিই তার স্বতন্ত্রতা পেতে পেরেছে। গল্পকারের রচিত 'বৃষ্টিবদল' গল্পটির বর্ণনায় নারীর স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে নিশ্চয় একটি প্রশ্ন পাঠকমণ্ডলীর মনে জাগতে পারে। বর্তমান কালে নারী যে বিভিন্ন রকম ব্যবহারের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু নয় তা ধরা পড়েছে ক্যামেরা বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তির কাছে, যিনি গল্পটির বক্তা।

নির্মল ঘোষ নামক এক ক্যামেরা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ক্যামেরার আড়ালে ধরা দেয় প্রকৃতির নানারূপ প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ, গ্রাম শহরে বৃষ্টিপাতের রকমফের, রৌদ্র ওঠার পর সবুজের উজ্জ্বল আলোক ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিঁখুতভাবে যেন সে ক্যামেরার আড়াল থেকে দেখতে পায়। কিন্তু এইগুলো সবই কাল্পনিক, বাস্তবে সে সিরিয়াল প্রোডাকশনের কাজ করে। ক্যামেরা নিয়ে কাজ করার মত আগ্রহই তার মনে থাক। হিসেব নিকেশে পরিপুক্ত না হওয়ায় ক্যামেরা হাত থেকে তার ফসকে যায়। প্রোডাকশনের কাজের সূত্রেই সে সেদিন বেরিয়েছিল। গভর্ণমেন্ট এক বিশেষ এ্যাড করার সুযোগ সে পেয়েছে। প্রচুর মানুষের প্রতিযোগীতায় যখন নির্মলদের গ্রুপ এই অর্ডার টার পেয়েছে তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান ছাড়া নির্মলের অন্যকিছু মনে হয় না। সেই কাজের সূত্র ধরেই প্রসাদ নামক এক ব্যক্তির কাছে তাকে যেতে হবে যেখানে বাস্তব জীবনের হিসেব নিকেশটা তার কাছের অনেকটা স্পষ্ট হয়। নারীর ব্যবহার্যতা কতভাবে বর্তমানে হতে পারে তার হিসেব এবং সেই ব্যবহারের বিনিময়ে কতটুকু পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ

হবে তা সম্পর্কে নির্মল ঘোষের ধারণা পূর্বে ছিল না। মা-সন্তানের একটি বিশিষ্ট অ্যাড করতে গিয়ে যে বাস্তবতা তার চোখে ধরা দেয় তাতে সমাজের নগ্নতায় নারীকে শিকার হতে দেখা যায়। মা সন্তানের বিশিষ্ট অ্যাড যদি কেউ সভ্যতা শালীনতা বজায় রেখে প্রদর্শন করতে চায় তখন আমাদের সরকার শ্রেণিতা রিজেক্ট করে দেন অথচ সেই অ্যাড-ই অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পারে যদি মা-কে প্রায় নগ্ন হিসেবে পেশ করা যায় এবং এতে জনপ্রিয়তা অধিক হবে কারণ জনগণ মা সন্তানের সম্পর্ক ব্যতীত যৌন উচ্ছাসের বশেই বার বার অ্যাডটি দেখতে চাইবে। পাঠক মণ্ডলীর মনে এই সময় প্রশ্ন জাগতে পারে তবে কি বর্তমান যুগ নারীকে এমন কী মা-সন্তানের পবিত্র সম্পর্ককেও রোজগারের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করছে? পাঠক মণ্ডলীর অবগতর জন্য তাই বলছি নারীকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যুগ যুগ ধরেই চলছে বর্তমানে কেবল তার রূপ পাল্টেছে। শুধু দুঃখের বিষয় এটিই যে পূর্বে নারী চেতনা বাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি কিন্তু বর্তমানে এই চেতনাবাদের আবর্তে ঘিরে থেকেও এই ধরনের ব্যবসা ব্যবসার জগতে তুঙ্গে উঠে এসেছে। ব্যবসায়ী নির্মল অভিজ্ঞ চোখের ল্যান্সের আড়ালে ব্যবসার জগতে নারীর প্রয়োজনীয়তা তাই স্পষ্ট দেখতে পান। তার মনোজগতে সামান্য উঁকি দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়—

> ‘‘লেন্সের পেছন থেকে এন-জি আরো আরো দেখে মেয়েদের কত রকম বুক, সব বুক থেকেই ত আর বাচ্চারা দুধ খায় না, কত রকম কাজেই ত লাগে মেয়েদের বুক, কত রকম কাজেই ত লাগানো যেতে পারে মেয়েদের বুক।’’[১৩]

নারী যেভাবে আপন মর্যাদা হারিয়ে দিনের পর দিন পণ্য সামগ্রী হয়ে উঠছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নারীর পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

দেবেশ রায়ের ‘গান্ধারীর চোখ’ ছোটগল্পটি উল্লেখিত সবকটি গল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী। সমাজের নৃশংসতা মানুষের মনোজগতে কতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারে তারই এক নগ্ন কথন গল্পকার এই গল্পটির মাধ্যমে পেশ করেছেন। সমাজে যা কিছু ঘটে চলে চলেছে, যা আমাদের আশেপাশে যা কিছু অপ্রিয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমরা এড়িয়ে চলতে চাইলেও আমাদের অবচেতনে তার প্রবেশ নিশ্চিত। মানুষ তার মনকে যতই ধরে রাখার চেষ্টা করুক না কেন এই প্রবেশ দ্বার সে রুদ্ধ করতে পারে না। মনের কোণে সুপ্ত থাকা এই অপ্রিয় বাস্তব চিরটাকাল থেকেই যায়, এর থেকে মুক্তি নেই। তার উপর যদি সেই অপ্রিয় ঘটনাগুলো নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন তা মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে যন্ত্রণার শিকার হতে বাধ্য করে। দুর্নীতি ও শোষণ দেশকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে আজ তা রাস্তাঘাটে বার বার প্রমাণ হতে দেখা যায়। বুর্জোয়া শ্রেণির তৈরি করা জাল থেকে দেশের মুক্তি নেই, এই কারণেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দেশের অসংখ্য কোণায় অসংখ্য লোকের আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে এবং সে ঘটনায় রাষ্ট্রের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অহরহ ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর প্রতি যখন রাষ্ট্র নির্বিকার থাকে তখন আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে তবে কি সরকার অন্ধ? আমাদের এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হয়তো গল্পকার গল্পটির নাম গান্ধাধীর চোখ রেখেছেন অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র চোখ থাকতেও অন্ধ। গল্পের নামকরণের হয়তো অন্যান্য কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে। যাইহোক আমাদের আলোচনার বিষয় তা নয়। সমাজের বাস্তবকে তুলে ধরা এবং তার সঙ্গে মনোজগতের সম্পর্ক নির্ণয় করাই এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

গল্পের বক্তা বি. বি. দত্তের আত্মকথনে বোঝা যায় তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তকাল এবং তারপরের দেশের পরিস্থিতি, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। যুদ্ধের সাইরেন বাজা, ট্রেঞ্চ কাটা, বোমা ফালানো ইত্যাদির সঙ্গে তার পরিচয় গভীর। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনাগুলো তার জীবনে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানোর কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না কারণ মনের অবচেতনের কোনো

এক কোণায় তার প্রতিফলন লুকিয়ে থাকে। তার উপর এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বি.বি. দত্তের পুত্র নিঁখোজ কিংবা হত্যার ঘটনা। তিনি জানেন না রাষ্ট্র তার ছেলেকে হত্যা করেছে কি না, আর যদি করেও থাকে সে হত্যা তিনি স্বীকার করেন না পুত্র দোয়েলকে যখন হত্যা করা হয় কিংবা দোয়েল যখন নিঁখোজ হয় তখন সে কিশোর বয়সের ছিল। বয়সের স্বচ্ছতার কারণেই হোক কিংবা পরিস্থিতির কারণেই হোক যখন দোয়েল আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে রাষ্ট্র গরিবদের জন্য নয়। আমরা আমাদের দেশকে যতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দেই না কেন আসলে রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছে কেবল উঁচু তলার লোকেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই। কিশোর দোয়েলের রক্তে রক্তে যখন এই বাস্তব সত্যটি প্রবেশ করে তখন তার নিজেকে থামিয়ে রাখা আর সম্ভব হয় না। সে চিন্তা করতে থাকে কীভাবে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায়। সে আবিষ্কার করতে পারে রাষ্ট্র ও তার মধ্যে পার্থক্য কেবল এক বন্দুকের নলের এই নলতো যে কোনো ভাবেই তৈরি করতে পারে। পাইপ কেঁটে, কোনো নল কেটে কিংবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাছাড়া দা-ছুড়ি কুড়োল ইত্যাদিও তো রয়েছে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার জন্য রাষ্ট্র বোধ হয় সেদিন সেই বিরোধিতার খোঁজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মধুগুপ্ত লেনে। রাষ্ট্রের এত শক্তি, এত বোমা, এত বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তারা এই শক্তিহীন ক্ষুদ্র মধুগুপ্ত লেনে কেন ঝাপিয়ে পড়ল। তাদের কি মনে হয়েছিল এই লেনে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির অসুরক্ষার বাণী লুকিয়ে রয়েছে। সেদিনের সাইরেন বাজার পর বহু পরিবারের বহু কিশোরকে আর পাওয়া যায় না। প্রতিদিন কিছু ডেড বডি রাষ্ট্র ফেলে রেখে দে তা থেকে কিংবা মর্গে মর্গে গিয়ে মধুগুপ্ত লেন বাসী নিজেদের পুত্রকে শনাক্ত করত বি. বি. দত্তও এইভাবে দোয়েলকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পাননি অথবা পেতে চাননি। এই মৃত্যুকে তিনি কোনোভাবেই স্বীকার করতে পারেন না। প্রতাপের বিচ্ছুরণ যতই তীব্র হোক প্রতিবাদী দল অবশ্য এত তাড়াতাড়ি ভেঙে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। তাই জন্ম নিল ফেরাই, বি. বি. দত্তের তৃতীয় সন্তান। যখন দোয়েলের বাবা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তখন বি. বি. দত্ত বাবা হয়ে বসলেন, এতো নিয়তির কোনো উদ্দেশ্য হতে

পারে। কোনো নির্ধারিত পরিকল্পনা ছাড়াই অনামিকা তার ছোটো ভাইকে ফেরাই বলে ডাকতে শুরু করে, যেন দোয়েল তার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আবার ফিরে এসেছে। ফেরাই চলে আসার পর বাহ্যিক ভাবে সব স্বাভাবিকভাবেই চলে।

বি. বি. দত্তের নামকরণের উদ্দেশ্য গল্পটিতে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে এইটুকু বোঝা যায় বিপদকে মোচন করার সব রকম ক্ষমতা যাতে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তারই ব্যর্থ চেষ্টা। ব্যর্থ এই অর্থে যে বি. বি. দত্ত তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিপদকে মোচন করতে পারেননি। দোয়েলের নিঁখোজ বা মৃত্যু হওয়ার ঘটনাটা তার মনে এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে তা ফেরাইর ক্ষেত্রে আবার কার্যকরী হয়ে ওঠে। স্বরাষ্ট্রে বাস করেও যখন নিজের সন্তানকে এমন অসুরক্ষার কবলে দেখতে হয় তখন সেই রাষ্ট্রের প্রতি বি. বি. দত্তের তীব্র ধিক্কার। রাস্তা-ঘাটে, স্টেশনে বাসস্ট্যাণ্ডে ঘটে যাওয়া খুন বা অন্যান্য ভয়ংঙ্কর ঘটনা মৃত্যু সম্পর্কে বি. বি. দত্তের ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে। শরীরের কোনো এক ভিতরের জায়গা থেকে বিরেয়ে আসা মৃত্যু ও বাইরের থেকে শরীরের ভিতরে যাওয়া মৃত্যুর পার্থক্য বি. বি. দত্তের কাছে স্পষ্ট। এতটাই স্পষ্ট যে তিনি এখন নিজের শরীরের ভিতরে সেই মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে পারেন। রাত্রিতে বাড়ির মাঝামাঝি কক্ষে শুয়ে বি.বি. দত্ত তার বাঁ বুকের ভিতরে সেই মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে পারেন। সকালবেলা দরজা খুলে পরিবারের সকলেই খুব সহজে দেখতে পান বাঁ বুকের মৃত্যুটা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

২

ঔপন্যাসিক দেবেশের রচনাসমগ্র কখনও কেবল মনোরঞ্জনের জন্য আত্মপ্রকাশ করেনি। জীবনের বাস্তববোধ, সমাজের নগ্নতা, মনস্তত্ত্ব দিক এবং বহু না বলা কথাকে ভাষা দানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ঔপন্যাসিক দেবেশের কথন বিশ্ব। কখনও কখনও তাঁর উপন্যাসের গতি এমন এক ধারায় ছুটে চলেছে যার গন্তব্য স্থল অনিশ্চিত কিংবা উদ্দেশ্যহীন এবং সেই গতি যে কোনো বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেনি তার দৃষ্টান্ত মিলে

গড়ে ওঠা উপন্যাসের ভিতরেই। প্রতিবাদী লেখক তাঁর উপন্যাস ভুবনকে প্রচলিত প্রথা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে আপন যন্ত্রণার তাগিদে স্ব-রীতিতে নির্মাণ করেছেন যে কারণ বহু বার বহু ভাবে বহু সীমা লঙ্ঘন করে তিনি তার প্রতিস্পর্ধীতার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কী যে তত্ত্ববিশ্ব বর্তমান সাহিত্য জুড়ে বিরাজ করছে সেই তত্ত্ববিশ্বে প্রবেশের রীতিও নতুনত্ব বজায় রেখেছে দেবেশের উপন্যাসে তাই ঔপনিবেশিক চেতনাই হোক আর নারী চেতনাই হোক সমস্ত কিছু একঘেয়েমি প্রথা বাদ দিয়ে নতুন প্রাণ পেয়েছে দেবেশের কথনবিশ্বে। তাছাড়া এমন কতগুলো বর্ণনা তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে যা মানবমনের অবচেতনে গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং যার মন তার কাছেই তা অজানা থেকে যায়। ঔপন্যাসিক দেবেশ সেই সুপ্ত চেতনাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর ভাষায়, উপন্যাস হয়ে উঠেছে সুপ্ত চেতনার পটভূমি। বিভিন্ন উদ্দেশ্য রচিত উপন্যাসগুলি তাই সহজেই পাঠক মণ্ডলীর হৃদয়ে আপন মহিমায় বিরাজ করে। এই পর্বে দেবেশ রায়ের কয়েকটি উপন্যাসের সাধারণ পরিচয় আলোচিত হবে উল্লেখিত দৃষ্টিকোণের আলোকে।

নারী তার মনের কথা সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞাত? নারীচেতনাবাদ নিয়ে যারা আজ চিৎকার করে মরছে তারাইবা কতটুকু জানে নারীর মনের কথা সম্পর্কে? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর সম্পর্কে সংশয় অবশ্যই থেকে যায়, কারণ নারী তো তার মনের গভীরের সত্যটাকেই সঠিকভাবে ধরতে পারছে না। তা তাঁর কাছে ধোঁয়াশা থেকে যায়। এমনই এক ধোঁয়াশা কথন জানার উদ্দেশ্যেই হয়তো দেবেশ রচনা করেন তাঁর জোড়া উপন্যাস 'নভেল জোড়', যেখানে নারীর দেহে অনুসন্ধান করা হয় তার নারীত্ব। আপাত বিচ্ছিন্ন উপন্যাস দুটি যে এক সূত্রে বাধা তা বোধগম্য করতে খানিকটা সময় লাগলেও গঠনের শেষে উপন্যাস দুটোকে একই চেতনায় আবদ্ধ করতে পাঠক বাধ্য। নারী দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা অনুসন্ধানের পর নারী কতটুকু নারী হয়ে উঠতে পারে সেই প্রশ্নেরই তো মীমাংসা খোঁজার চেষ্টা করতে চেয়েছিল উপন্যাসের কাহিনি। কিন্তু নারী যে তার নারীত্ব শরীরের কোনো অঙ্গেই উপলব্ধি নাও করতে পারে এবং সে তার নারীত্বকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ এক মানব হয়ে উঠতে পারে সেই সম্ভাবনাও তো থাকতে পারে,

ঔপন্যাসিক কাহিনির গতি ধারায় এই বাস্তবকেও স্পষ্ট করেছেন। দুটো উপন্যাসের পর পর আলোচনায় বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হবে।

উত্তর আধুনিক যুগের সমস্ত ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। প্রাচীনপন্থীকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আধুনিকতার মায়াজালকে ছিন্ন করে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে উত্তর আধুনিক যুগ। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ইঁদুর দৌড়ের ন্যায় ছুটে চলা এই মানবজগত নিজের সম্পর্কে প্রায় ভুলতে যেতে বসেছে। সংকীর্ণ সময় তাদের এই কাজে উদ্যত করলেও কখনও কখনও মানুষের জীবনে এমন কতগুলো মুহূর্তের আগমন ঘটতে পারে যখন নিজেকে জানার বড় ইচ্ছে জাগে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে মানুষ যখন যান্ত্রিক হতে চলেছে তখন 'নভেল জোড়' উপন্যাসটি সেই মানুষের কাছে উপহারস্বরূপ হতে পারে। কারণ এই উপন্যাস স্বল্প মুহূর্তের জন্য হলেও যান্ত্রিক সভ্যতা ভুলিয়ে মানুষকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। মানুষের মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা রহস্যকে মানুষের মনে পেঁছে দিতে পারে। প্রথম উপন্যাসের শুরুতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিনিময়ের মাধ্যমকে উল্লেখ করায় উত্তর আধুনিক যুগে বসবাসকারী মানব সভ্যতার দ্রুততার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমই দ্রুত সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি চরিত্রের জীবনযাত্রার মাধ্যমে লেখক আপন বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি উপন্যাসের পর্ব বিভাজন করতে যান্ত্রিক সভ্যতার আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপগুলোরই সাহায্য নিয়েছেন। রুনা, সুমন, অঞ্জন, গৌতম, পবিত্র, সালকি, মোতে এরা প্রত্যেকেই অ্যাড এবং অন্যান্য প্রোডাকশনের কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা তাদের কাজ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে একটু বেশিই জড়িত ছিল। তাদের প্রোডাকশনের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে যা কিছু ধরা পড়ে তাতে এবং উপন্যাসের শেষ ভাবনায় পৌঁছনোর পূর্বে ঔপনিবেশিক মায়াজাল আমাদের চোখে আরও একবার ধরা দেয়। অর্থাৎ মিঃ বিন্‌স এর নকল যখন তারা তৈরি করে অথবা ইণ্ডিয়ান প্রোডাকশন যখন হলিউডের প্রোডাকশনকে নকল করতে ব্যতিব্যস্ত তখন তো এক অর্থে ইণ্ডিয়াকেই অবহেলা করা হয়। আর সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয় হলো ইণ্ডিয়ান দর্শকরা তো সেই ছবিগুলো দেখতে অধিক আগ্রহ

জোগাড় করে। তাছাড়া কলকাতা শহরের আধিপত্য নির্মাণে ঔপনিবেশিক হাতের ছোঁয়া পাওয়া যায়। সুমন আর অঞ্জনের বার্তালাপে বিষয়টি স্পষ্ট—

> ''সমস্ত শহরটা তো ইংরেজের তৈরি। ইংরেজের দরকারে তৈরি। ইংরেজ ছাড়া এ শহরের কোনোও গড়ন নেই, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, এ শহরের হেরিটেজ মানে একশো শতাংশ ইংরেজ, সেই হেরিটেজকে যে খোঁজা হচ্ছে, তার মানে তো ইংরেজকে খোঁজা হচ্ছে।''[১৪]

ঔপনিবেশিকই যখনই ইণ্ডিয়ার ভিত্তিভূমি তৈরির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে পড়ে তখন যে ইণ্ডিয়ার অস্তিত্ব খোঁজা অর্থহীন হয়ে পড়ে তাতে সন্দেহ নেই। তার উপর ইণ্ডিয়াকে এরা এখানেই মুক্তি দেয়নি। বৈদেশিক মাল বিক্রয়ের মাধ্যমেও দেশকে শোষণ করার আধুনিক ও প্রযুক্তিগত পথ তারা বের করে এবং এক্ষেত্রে ভারতীয়রা কেবল মাত্র দর্শক হিসেবেই বিরাজ করতে পারেন সুমন ও অঞ্জনের বার্তালাপের আরও কয়েকটি বাক্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''ওরা এ দেশে ওদের মাল বেচবে। এতে কোনও গোলমাল নেই। এদেশের খদ্দেরদের যাদের ইচ্ছে ওদের মাল কিনবে। এতে কোনও গোলমাল নেই। ওরা ওদের মাল নিয়ে বাজারে এসেছে, সেটা ঢাক পিটিয়ে জানাবে। এতেও গোলমাল দেখছি না রে। আমরা ঢাকিরা কাজটা পেয়েছি। এতেও গোলমাল নেই। আমরাতো প্রফেশনাল ঢাকি।''[১৫]

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের জোড় যখন এদেশে বর্তমানে এতই প্রবল হয়ে উঠেছে তখন তো আমাদের দেশ তার নিজস্ব কীর্তি হারাতে বাধ্য। এরকমই পরিস্থিতিতে সুমনদের গ্রুপ এমন একটা কাজের অর্ডার পায় যাতে প্রয়োজন পরে একটি ফিমেল বডির। মানুষ তার মনুষত্ববোধ হারিয়ে নারীকে সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। একটি ফিমেল বডির অনুসন্ধানে শর্ত ছিল এমন এক বডি ডা দেখলেই ভারতবর্ষের কথা মনে

হয়। যা হতে হবে একেবারে নতুন অথচ প্রাচীনের স্মৃতিতে ঘেরা, যার ব্যবহার ইতিমধ্যে হয়নি। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন নিজের অস্তিত্ব হারাতে চলেছে তখন ভারতীয় নারীরা কী করে ভারতকে নিজের শরীরে ধরে রাখবে তার মধ্যে আবার প্রয়োজন পড়ে এক্সশেপশনাল নারীর। ঔপন্যাসিকের চিন্তায় ধরা দেয় এক্সনেপশনাল নারীর অর্থ কী? অর্থাৎ তিনি তো এক নারী থেকে অপর নারীকে পৃথক করার কোনো হদিশ খুঁজে পান না। চিন্তাজগতে হারিয়ে যাওয়া ঔপন্যাসিক ঠিক তখনই আবিষ্কার করতে পারেন মানবজাতি তো একই সূত্রে গাঁথা কেবল নামকরণের মাধ্যমে এতটা পৃথক। যেন— সারা পৃথিবী জুড়ে একই সমুদ্র—

> ''আসলে তো সারা পৃথিবী জুড়ে একটাই সমুদ্র। না। ভুল হল একটা সমুদ্রের জলেই তো পৃথিবী ভাসছে। অথচ সেই এক সমুদ্রকে ঘাটে ঘাটে কত নতুন নাম দেয় মানুষ।''[১৬]

একই সত্যকে যখন উত্তর আধুনিক পৃথক পৃথক নামকরণে পরিচিত করায় তখন বর্তমান সভ্যতা তাকে গোড়া থেকেই পৃথক হিসেবে জানতে শেখে। বাস্তববোধের চরম মুহূর্তে অঞ্জন আর সুমনের কাছে ধরা দেয় আরও এক সত্য যা যুগের পর যুগ ধরে আতিশয্য ও নাটকীয়তার আড়ালে চা পা পড়ে যায়—

> ''পুরনো কালের লিথোগ্রাফিক প্রিন্টের স্টাইলে নানা সাইজের ও আকারের সলিড কালো-র টুকরো দিয়ে তৈরি একটা স্পেস। নারীশরীরের কোনও ইশারা কোথাও নেই। অথচ নির্ভুল কুঁদে তোলা হয়েছে এক নারী পরিসর। নানা আকারের কালো সলিডের জন্যই মনে হয় কুঁদে তোলা। পরিসরের নারীত্ব বোধহয় বয়ে যায়—প্রতিটি সলিডকে পৃথক করে রাখা ভেজা বালি রঙের ছাড়গুলোতে। প্রায় সেই স্টাইলেই লেখা আছে—ডু ইউ ফিল এনি স্পেস

ফর ইণ্ডিয়া এনিহোয়্যার ইন ইওর ফিজিক?"[১৭]

সারফিও উপন্যাসে বাস্তববোধের ভিত্তিকে ঔপন্যাসিক এমনভাবে নাড়া দেন যে বর্তমান যুগের ফাঁপা সভ্যতাও নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করতে শুরু করে।

'অতল জলের তলে' উপন্যাসটি সারফিউ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। সারফিও যেখানে জীবিকা নির্বাহের উপায় মানুষকে নিজের অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যায় সেখানে 'অতল জলের তলে'—এ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই তাকে তার অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে পারে। তাই সম্পূর্ণ পৃথক হয়েও উপন্যাস দুটি যেন একই সূত্রে গাঁথা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চিনি নিজের ভিতর এমন কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল যা তাকে তার সত্ত্বার কাছে টেনে নিয়ে যায় বটে তবে সেই কল্পনাকে ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা চিনির ছিল না। চিনির কল্পজগতের মীমাংসাহীন কিছু পরিণতিকে ভাষা দিতেই কিংবা ঔপন্যাসিকের নিজের মনোজগতে লুকিয়ে থাকা কোনো সুপ্ত চেতনাকে প্রকাশ্যে আনতেই যেন অতল জলের তলে উপন্যাসটির অবতারণা। ঔপন্যাসিক যেন এমন বাস্তববোধের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেই চিনি, গুরুং ইত্যাদি চরিত্রের দ্বারা নির্মিত এক কাল্পনিক কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। ঔপন্যাসিক আবার সন্দেহের বশে একথাও স্বীকার করেন যে তার বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছতে পারল না কি সেই হৃদয়েই ধাক্কা খেয়ে পুনরায় তার কাছে ফিরে আসল? অসংখ্য সংশয় নিয়ে 'অতল জলের তলে' উপন্যাসটির অবতারণা।

বর্তমানযুগের পরিবার পরিকল্পনার আধারে নির্মিত চিনি, কণ্ঠেস্বর ও গুরুং-এর ছোট পরিবার নগর সভ্যতার জীবনে একটি ছোট ফ্ল্যাটের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বসবাস করতে অভ্যস্ত। বাইরের থেকে দেখতে গেলে নির্জঞ্ঝাট এই পরিবারে সুখের ফোয়ারা উপচে পড়ছে। কিন্তু সংসারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ হয়তো ঠিক এর বিপরীতে অবস্থান করতে বাধ্য। চিনি তার মনে এই বিপরীত অবস্থানকে ধীরে ধীরে এমনই প্রবল করে তোলে যে জীবনে গভীর এবং না বলা সত্যগুলো তার কল্পনার মাধ্যমে বাস্তবরূপ ধারণ করতে শুরু করে। বিয়ের পূর্বে চিনি তার স্বামী কণ্ঠেস্বরের বিচার বুদ্ধিতে যতটা

প্রসন্ন হয়েছিল বিয়ের পর স্বামীর আধিপত্য তাকে এর শতগুণ অধিক বিরক্ত বোধ করায়। প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি পদক্ষেপে স্বামীর আধিপত্য সূচক ব্যবহারে চিনি নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে ভুলে যায়। নিজের বিরক্ত বোধটাকে তাই বার বার আরও একটু ভোঁতা করে চিনি নিজের মনোজগতে অতল জলে তলের মতই তলিয়ে যেতে থাকে এবং সেখানে আশ্রয় নেয় উপন্যাসে বর্ণিত এমন এক কল্পনার। বিয়ের পর স্বামীর সাথে চলার প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে চিনি তার স্বামীকে পুরুষ হয়ে উঠতে দেখেছে। দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকে এই উপলব্ধি কার্যকরী হতে শুরু করে। গুরুং-এর জন্মের পর তার নামকরণের ব্যাপারে চিনির পরামর্শ ছিল গুরুং-এর নামকরণে মিত্র মালকাপ বা মালকাপ মিত্র যাতে লেখা হয় কিন্তু গুরুং-এর বার্থ সার্টিফিকেট চিনির ব্যর্থ চেষ্টাকে রূপ দান করে অর্থাৎ শুধুই মালকাপ পদবীতে গুরুং আধিপত্যের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠে। শুধু কি তাই, কণ্ঠেস্বর সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমনো পর্যন্ত তার ক্ষমতার অধিক এক ফাঁপা আধিপত্য প্রকাশে ব্যস্ত থাকে তা ঔপন্যসিক চিনির মাধ্যমে নিঁখুত বর্ণনায় পেশ করেছেন—

> ‘‘খাওয়ার টেবিলে চিনি তার আর কণ্ঠেস্বরের মাঝখানে জলের জগটা রাখতে শুরু করল যাতে কণ্ঠেস্বরের হাঁ করা চিবুনো তাকে দেখতে না হয়, ঢক ঢকিয়ে জল-খাওয়া তাকে দেখতে না হয়। রাতেই তো একসঙ্গে খাওয়া—খাওয়ার পর চিনি গুরুঙের সঙ্গে গল্প করে—যাতে কণ্ঠেস্বর ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ভিতর কণ্ঠেস্বর নানা আওয়াজ করে, গলায়, নাকে, সকালে বাথরুমের দরজা খোলা রেখে কণ্ঠেস্বর জোরে আওয়াজ করে জিভ চাঁছে, হ্যাক হ্যাক করে গলা পরিষ্কার করে, ওয়াক-থু করে মুখ ধোয় যেন ঐ আওয়াজগুলি ছাড়া সে পরিষ্কার হয় না।’’[১৮]

পুরুষের আধিপত্য সূচক এই অভ্যাসগুলো দাম্পত্যজীবনের অভিজ্ঞতায় চিনির

কাছে ধীরে ধীরে অত্যন্ত পরিচিত এবং বিরক্তিবোধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কণ্ঠেস্বর যখন তার পুরুষচেতনার অভ্যাস বশত চিনিকে সমমর্যাদার স্থান দিতে রাজী নয় তখন চিনিও সেই মর্যাদাকে অস্বীকার করে বাস্তববোধকে আঁকড়ে ধরে। চিনি তার শিক্ষাগত কারণেই হোক কিংবা অভিজ্ঞতার কারণেই হোক উপলব্ধি করতে পারে যে জীবনটা আসলে পুরোপুরই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমস্ত রকম কোড-কে যেভাবে কেন্দ্র বাক্য হিসেবে প্রচলিত করা হয় তা আসলে পুরুষেরই নির্মিত, কেবল মাত্র গণতন্ত্র নামক এক লেপের আবরণে তা ঢাকা। তাই চিনি আজ সমস্ত কিছু অস্বীকার করে, অস্বীকার করে পুরুষের তৈরি এই কোডগুলোকে, অস্বীকার করে তাদের আধিপত্যকে, অস্বীকার করে পুরুষের শারীরিক চাহিদাকে, এমনই দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো সে তার ২৩ বছরের ছেলেকে আর পুরুষ হতে দিতে চায় না। তাই আশ্রয় নেয় এক যুক্তিহীন কল্পনার।

চিনি কোনও একদিন অকস্মাৎ জানতে পারে তার ২৩ বছরের কিশোর ছেলে পুরুষ হওয়ার সমস্ত অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নারী হতে চলেছে। তখন চিনি বুঝতে পারে না সেই মুহূর্তে তার কী করা উচিত তার মনোজগতে চলতে থাকে উথাল পাথাল, সে ভাবতে থাকে নারী পুরুষের বিভাজন তত্ত্ব মানবসত্ত্বা যখন এক ছিল, নারী পুরুষ বলে কোনো বিভাজন ছিল না তখনও তো মানুষ শান্তিতে ছিল। তাহলে এই বিভাজনের অর্থ কি? মানবসত্ত্বাকে ভাগ করে নারী ও পুরুষ দুই ভাগ তৈরি করা এবং সমস্ত মালিকানা পুরুষের হাতে চলে যাওয়ার অর্থ তো মানবসত্ত্বার অর্ধেক ভাগ শোষিত হওয়া। নারী কেন এই বিভাজনে শোষিত হবে? নিজের অধিকার ছেড়ে এই চক্রান্ত চিনি কিংবা নারী সমাজ যুগ যুগ ধরে মেনে এসেছে। ভাবনার এমন উথাল পাথাল মুহূর্তে গুরুংয়ের ডাকে চিনি গিয়ে দেখতে পায় গুরুং তার পুরুষ হওয়ার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করে সেই সমস্ত চিহ্ন ধারণ করে যা মানুষতে নারী করে তোলে। চিনির সংশয় হয় ২৩ বছরের কিশোর কি নারীত্ব লাভ করায় নারীর যৌনচেতনার সঠিক অধিকারী হতে পারবে? অধিকার সংক্রান্ত এই চিন্তা চিনির মনে স্থান করে নিলেও স্বল্প মুহূর্তের জন্য

চিনি নতুন এক যৌন অধিকারীণি নারীর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে উঠে। গুরুং-কে পুনরায় পুরুষ করে নেওয়ার ক্ষমতা চিনির নেই তবে এই ঘটনায় জীবনের কিছু না বলা বাস্তব অভিজ্ঞতা চিনির কাছে ধরা দেয়। গুরুং-এর নারী হয়ে উঠা কোনো অপরাধ নয় অথচ এই ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এর দায় যেন চিনিকেই নিতে হবে। আসন্ন বিপদের কথা ভাবতে ভাবতে চিনি আবিষ্কার করে দাম্পত্যজীবনে ভিত্তিভূমি আসলে কোথায় লুকিয়ে আছে? এখানে চিনির ভাবজগতে একটু উঁকি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে—

> ''নারীর যৌনতা তার নিজের, চিনির একার যৌনতা কোনো একটা শারীরিক কাজ নয়। তেমন একটা শারীরিক যৌনতার জন্য হয়তো স্বামী-স্ত্রী হওয়াই ভাল। সেই শারীরিক সংগম তো চিনির অজস্র অগনন যৌনতা ধ্বংস করে দেয়। দাম্পত্য যখন তৈরি হয়েছিল, তখন নারী যৌন হয়ে ওঠার বয়সই হয়নি। এখন নারীর যৌনতা তার ভিতরে একটা ভুবন তৈরি করে ফেলেছে। সেই যৌন ভুবনের ধ্বংসের ওপর দাম্পত্য টিকে আছে।''[১৯]

দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিভূমি যখন নারীর শারীরিক ক্ষয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠে তখন সেই দাম্পত্যকে অস্বীকার করে চিনি। প্রতাপের বিচ্ছুরণ চিনিকে মুহূর্তে মুহূর্তে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। এখন সে আর ২৩ বছরের গুরুংকে পুনরায় পুরুষ হিসেবে দেখতে চায় না।

গুরুংয়ের শরীরের আকৃতি পরিবর্তন হওয়ায় আসন্ন বিপদের কথা ভুলে গুরুং যখন তার মেয়ে বান্ধবীর সঙ্গে মোবাইলে ব্যস্ত ঠিক তখনই কণ্ঠেস্বর, গুরুংয়ের বাবার আগমন ঘটে। এই ঘটনার পর চিনি কণ্ঠেস্বরের আগমনের জন্য সকাল থেকে অধীর হয়ে উঠে অথচ তার আগমনের বার্তা পেয়ে চিনি নিজ মনে কোনো এক জায়গায় সংশয় উপলব্ধি করতে পারে। চিনির সংশয় হয় গুরুংকে তার নারী হয়ে উঠার প্রমাণ

দিতে গিয়ে হয়তো নারীর আত্মসম্মানের সর্বস্ব দিতে হবে। কণ্ঠেস্বর আর গুরুংয়ের মধ্যে হয়তো ঠিক তাই ঘটে উঠত যদি না মধ্যখানে চিনির অবস্থান থাকত। এই ঘটনায় আর কিছু প্রমাণ হোক বা না হোক এটা নিশ্চয় প্রমাণ হয় যে মানবসত্ত্বাকে দুইভাগ করে নারী নামক ভাগটিকে এমনই নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে যে নারী তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তার সবটুকু বিসর্জন দিতে বাধ্য। সদ্য গজিয়ে উঠা গুরুংয়ের কিশোরী স্তন ও যৌনাঙ্গ পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে কণ্ঠেস্বর যখন গুরুংকে ধর্ষণ করতে চায় এবং ঘটনার পরবর্তি ব্যবহৃত বাক্যতে চিনির ভাবনার সত্যতা যখন প্রমাণিত হয় তখন নারীর আত্মসম্মান সংকটাপন্ন। গুরুংয়ের প্রতি কণ্ঠেস্বরের উক্তি—

> ‘‘মেয়ে হতে ফুর্তিপাস এত। রেপ হতে ভয়? রেপ না হলে মেয়ে হয়? তোকে কমপ্লিট মেয়ে করে দিই?’’[২০]

চিনির কল্পনাশ্রিত ভাবনা যেন তার কল্পনাতেই বাস্তবায়িত রূপ খুঁজে পায়। চিনি জানে তার এই ধরনের অযুক্তি সম্পন্ন কল্পনার বাস্তবে কোনো জায়গা নেই তথাপি চিনি এই কথাকেও অস্বীকার করতে পারে না সে এই অযুক্তিগত কল্পনার আশ্রয়েই চিনি সমাজ ও মানব মনের সুপ্ত বাস্তবকে আবিষ্কার করতে পারে। চিনির ভাব জগতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে যা যা ঘটে যায় তার মনোবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন এই বৈজ্ঞানিক কারণগুলোর বশবর্তী হয়েই ঘটতে পারে নানারকম দুর্ঘটনা। অবচেতনের বশে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে স্বাভাবিক স্বভাব ফিরে পেতে মানুষের সময় লাগে ৪৫ মিনিট। এই ৪৫ মিনিটের মধ্যে মানুষ নিজের ভাবনার কাছে এতটাই অসাড় হয়ে যেতে পারে যে তখন মানুষ আর আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার রিমোটের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। ভাবনার আলোড়নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই রিমোটের দ্বারা খুণ পর্যন্ত হতে পারে।

চিনির কল্পনাশ্রিত ঘটনা মীমাংসা পথে এগিয়ে যায় তখন চিনিকে এক স্বস্তির শ্বাস নিতে দেখা যায়। এই স্বস্তি যেন নারীজগত থেকে পুরুষ বহিষ্কার করার এক স্বস্তি। প্রতাপ মুক্ত এক পরিবেশে চিনি নিজের ভিতর নারীসত্ত্বাকে খুঁজে পায় এবং চেষ্টা করে

সদ্য কিশোরী হওয়া গুরুং ও যেন নিজের সত্ত্বাকে এইভাবে খুঁজে পায়। সেই নারীসত্ত্বার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই তারা একে অপরের ভেতর লেপ্টে যায়। তারা নিজেদের ভেতর এতটাই লেপ্টে যায় যে তাদের অস্তিত্বকে তারা এত ভেতরের গভীরতা থেকেই স্বচ্ছভাবে দেখতে পায়, কুয়োর শূন্য অতল তলে চিনি তার প্রতিবিম্ব কে যেন এই প্রথম খুঁজে পায়।

ঔপন্যাসিক দেবেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে সমস্ত সভ্যতা যখন যান্ত্রিকতার পিছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত ছুটে চলেছে ঠিক তখন আমদানিকৃত প্রযুক্তিকে তীব্র ভাবে উপেক্ষা করে মানবকে মানবের অস্তিত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছেন। শিল্পী সাহিত্যিক দেবেশ জানতে পেরেছিলেন যান্ত্রিক সভ্যতার চোরা সার্থকে। যান্ত্রিক সভ্যতার চোরা সার্থের নগ্ন চেহারা উপস্থাপনের চেষ্টাতেই তিনি উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে—প্রবন্ধটিতে কতগুলো বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—

> ‘‘কলোনির যুগ আক্ষরিক ভাবে শেষ হয়ে গেলেও, সেই টেকনোলজিই কী আক্রমণ ঘটাতে চাইছে ভারতবর্ষের মত যাকে বলে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর।’’[২১]

এই ধ্রুব সত্য যখন পাঠকমণ্ডলীর সম্মুখে পরিবেশিত হয় তখন পাঠকমণ্ডলী ও অন্তত একবার যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইবে। এমন কী এই ধ্রুব সত্যগুলো আমাদের কর্ণগোচর না হলেও অনেক সময় আমরা নিজের জীবনের ঘটনাচক্রে কখনও কখনও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবাদ করে বসি। পার্থক্য শুধু এই যে, সেই প্রতিবাদের কোনো স্পষ্ট ভাষা নেই। প্রাবন্ধিক দেবেশ আমাদের এই অভাব পরিপূর্ণের সার্থেই উল্লেখিত বাক্যের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে এর যথার্থ রূপ দিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণে আমরা না চোইতেও আধুনিক টেকনোলোজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। কিন্তু নির্ভরতা যদি অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন তা কোনোসময়ই সুখদায়ক হয় না। ‘জন্ম’ উপন্যাসে সেই অস্তিত্বই টানাপোড়েনের মধ্যে ঝুলে থাকে কেবল আধুনিক টেকনোলোজির আরও অগ্রগতির তাগিদে।

নৈমিষ আর কুচির সুখের দাম্পত্যজীবনে ছায়া পড়ে আধুনিক টেকনোলোজির। নিজেদের এক সামান্যতম দুর্বলতা কিংবা প্রকৃতির এক লীলা বলা যায় যাকে, তারই সুযোগে জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিতে চায় উপনিবেশের তৈরি করা আধুনিক টেকনোলোজি। মাত্র এক সন্ধ্যার বিবরণে কুচি ও নৈমিষের আত্মিক সম্পর্ক বিপরীত মোড় নেয় গত দশ বছরের সমস্ত টান ভুলে দীর্ঘ দশ বৎসর যখন এক সন্ধ্যায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে, যখন সবচেয়ে কাছের মানুষটা এক সন্ধ্যায় বহুদূরে চলে যেতে পারে তখন আধুনিক টেকনোলোজি যে জয়ের পতাকা উত্তোলন করে এতে সন্দেহ নেই। কুচি ও নেমিষের সন্তান না হওয়া কোনো অপরাধ নয় অথচ এক অপরাধ বোধের দায়ে দুজনকে সারাজীবন পিষ্ট হতে হবে। এই অপরাধ বোধটা তো তাদের জীবনের আসার কোনো কথাই নয় কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা তার ছলনা থেকে কুচি আর নৈমিষকে কখনই মুক্তি দিবে না। সন্তান লাভ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হওয়ার চেষ্টায় কুচি আর নৈমিষ ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলে তারা এমনই এক বাস্তবের সম্মুখীন হয় যা তাদের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়। ডাক্তারের বক্তব্যের তাৎপর্য অনুযায়ী, এতদিনে ধরে যে মানুষটার শরীর ও মনের প্রত্যেকটি অংশ জুড়ে কেবল কুচিই ছিল, সেই কুচিই না কি নৈমিষকে চেনে না। নৈমিষের শরীরে না কি এমন কতগুলো অভাব আছে যা কুচিকে তাদের শারীরিক সঙ্গমে সম্পূর্ণ সুখ দিতে পারে না। কিন্তু কুচি তো কোনোদিন তা উপলব্ধি করতে পারেনি। নৈমিষের সামান্য স্পর্শ ও তো কুচির সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করতে পারে। তাহলে আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারবাবুর কথাকে সে কেন মেনে নেবে? নৈমিষের আন্দোলিত করে দেওয়া স্পর্শ কুচির শরীরের গভীরতম সুপ্ত জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আধুনিক টেকনোলোজির সাহায্যে নিতে হবে এ কথাও কুচি মানতে রাজী নয়। কুচি আর নৈমিষ পরস্পরকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসা এমন চরমে যেতে পারে যে কখনও কখনও কুচি নৈমিষের মায়ের জায়গা দখল করে নেয় অর্থাৎ সদ্যজাত শিশুকে স্নেহ বশত যখন মা বুকে টেনে নেন এবং স্তন্যপান করান তখন মাতৃস্নেহের স্বরূপ প্রকাশ ঘটে, কুচি ও তো ঠিক একইভাবে নৈমিষকে স্তন্যপান করায়, তবে কেন তার

নতুন কোনো প্রজন্মের প্রয়োজন পড়বে? নৈমিষের শিশুসুলভ আচরণ কখনও কখনও কুচিকে বিরক্ত করলেও সন্তানের অভাব অবশ্যই মিটিয়ে দেয়।

অপরদিকে নৈমিষের শারীরিক অক্ষমতা নৈমিষকে তিলে তিলে প্রতিটি মুহূর্তে শোষণ করে নিঃশেষ করে ফেলতে চাইছে। পাঠক মণ্ডলী যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন তবেই দেখতে পারেন যে এই শোষণ প্রকৃত পক্ষে কোনো অভাব জনিত শোষণ নয়, এই শোষণ তো আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার শোষণ। কারণ সন্তান হওয়ার জন্য আধুনিক টেকনোলোজির সাহায্য নেওয়ার পূর্বে নৈমিষ তো নিজের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব করতে পারেনি। এমন কি নিজেকে স্ত্রী-র সম্মুখে হামেশাই যোগ্য পুরুষ মনে করেছে নৈমিষ। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার যে দীর্ঘ দশবছরের এই যোগ্যতাকে মুহূর্তে মিথ্যে করে দিল নৈমিষ আর কুচির সম্পর্কের গভীরতা। সম্পর্কের মিষ্টতা নৈমিষ সেই মুহূর্তের পর থেকে আর খুঁজে পায়নি এবং খোঁজার চেষ্টা করেনি। কারণ সে জানে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার নিজেকে মুক্ত করার সময় নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাদের শয়ন মুহূর্ত কিংবা যা সঙ্গম মুহূর্ত হতে পারত সেই মুহূর্তগুলোতে তা স্পষ্ট—

> ‘‘দশ বছরের বেশি তারা পরস্পরকে বিছানায় যে ভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে তুলতে তুলতে, ভুলে গেছে, তাদের শোয়ার বা ঘুমবার আলাদা আলাদা ভঙ্গিতেই তারা দশ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছে, আজ সেই ভঙ্গির মধ্যে কখন কোথা থেকে একটা নিরর্থকতা এসে গেল। খুব যে স্পষ্ট সে নিরর্থ, তা নয়। কিন্তু তাদের নিজেদের শোয়ার ভঙ্গি এমন অনভ্যস্ত লেগে যায় কেন আজ? শুতে শুতে, শুয়ে শুয়ে তাদের আজ মনে করতে হয় কেন, রোজ কেমন করে শোয়। নৈমিষ একবার কুচির দিকে কাত হয়, আবার চিত হয়ে যায়। কুচি যেন শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতে শরীরটাকে এদিক ও দিক করে।’’[২২]

নৈমিষ এবং কুচি সেদিন রাতে আর পূর্বের ন্যায় কাছাকাছি আসতে পারল না। শুধু যে সেদিন রাতেই তারা দূরে সরে গেল তা নয়, সেদিনের পর থেকে জন্ম না হওয়া মা বাবার সম্পর্ক হিসেবে কিংবা মৃত ভ্রূণের মা এবং বাবা হিসেবে তারা এতটাই দূরে চলে গিয়েছিল যে তাদের একান্ত নিজস্ব মুহূর্তগুলোও তাদের ক্ষণে ক্ষণে নিঃশেষ করে নেয়।

ঔপন্যাসিক আপাতভাবে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটালেও পাঠক প্রতিক্রিয়ায় যে উপন্যাসের সঠিক পরিসমাপ্তি ঘটবে তার আশা তিন অবশ্যই করেন। কারণ পাঠক যদি তার প্রতিক্রিয়ায় যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করে একমাত্র তখনই উপন্যাস তার পরিপূর্ণ রূপ খুঁজে পাবে। নৈমিষ আর কুচির একাকিত্ব পাঠকমণ্ডলীর মনে বিদ্ধ হয়ে সেই একাকিত্ব থেকে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে প্রতিটি পাঠক যদি বিন্দু বিন্দু প্রতিবাদ যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে ছুঁড়ে দেয় একমাত্র তখনই 'জন্ম' উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকের চেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এ যেন লেখকের সেই ভাবনার সঙ্গে তুলনীয় যে ভাবনা সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে'—প্রবন্ধে আশ্রয় পেয়েছিল—

> ''রবার্ট ক্লাইভ যখন মুর্শিদবাদে ঢোকেন তখন রাস্তার পাশে যত লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা প্রত্যেকে একটা করে ঢিল ছুঁড়লে সসৈন্য ক্লাইভ মারা পড়ত। টেকনোলজির আক্রমণ সেই আক্রমণের চাইতে ও ভয়ঙ্কর শিল্পসাহিত্যের বেলায় ভয়ঙ্করতর। আমাদের লেখকদের ভূমিকা নিরপেক্ষ গ্রাহকের, না তাঁরা রাস্তা থেকে ঢিলটা তুলে নেবেন—সেটা নির্ভর করে, কার ওপর জানি না।...''[২৩]

দেশিয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আলোচ্য উক্তির ইঙ্গিত ধরা দেয় ঠিক সেরকমই যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টার এক ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় নৈমিষ আর কুচির একদিনের কাহিনিতে।

আধুনিকতার সর্বগ্রাসী মোহ থেকে যেমন সাধারণ মানবের দমবন্ধ হয়ে আসছে ঠিক তেমনই তো দমবন্ধ হচ্ছে আধিপত্যের পীড়নে পীড়িতদের আর এ পীড়ন তো আর আজকের ঘটনা নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পীড়নের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতাপের আলোকচ্ছটায় পীড়িতদের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রতাপের সুদৃঢ় অস্তিত্ব স্থাপন। প্রতাপের অস্তিত্ব নির্ণয়ের চেষ্টাতেই প্রবল ভাবে ধরা দেয় অপর সত্ত্বার অস্তিত্ব। গেরার্ড রাউলকে দেওয়া সাক্ষ্যাৎকারে ফুকো জানিয়েছিলেন,—

> ''সমাজ দেহের সমগ্রতায় প্রতাপ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলি সক্রিয়। এরা অজস্র এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের মধ্যে এরা ব্যক্ত হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, প্রশাসনে, শাসক ও শাসিত শ্রেণির সম্বন্ধ বিন্যাসে এদের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়।''[২৪]

অর্থাৎ প্রতাপ তার নির্মিত সম্পর্কের জালগুলোকে সজীব গতিতে সক্রিয় করে তুলেছে। শুধু তাই নয় সেই সক্রিয় গতির লাগাম টেনেছে প্রতাপ স্বহস্তে। কিন্তু একবারও ভাবেনি তার ধৃত লাগামে ফাঁস লেগে অপর সত্ত্বার অস্তিত্ব কেবল টুকরো টুকরো নয়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর অপর সত্ত্বাই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন প্রতাপ তার নিজের অস্তিত্ব কোথায় খুঁজে পাবে? প্রতাপের বিকিরণকে অস্বীকার করে মুক্তির কামনা ক্ষুদ্র অপরসত্ত্বা আগেও করেছিল এবং এখনও করছে। কিন্তু সেই কামনায় হারাতে হয় তাকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়, অর্থাৎ যৌবন। রামায়ণ শ্রীরামের সপত্নী ও ভ্রাতা লক্ষণ সহ যৌবনকালে রাজসুখ ত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রতাপের আলোকচ্ছটার প্রতিফলন ও যৌবনকে অস্বীকার অপরদিকে মহাভারতে প্রতাপের ভিন্ন রূপ দেখা যায়। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসে। ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত হওয়া দ্বাদশ বর্ষের বনবাস পঞ্চপাণ্ডব বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেও এর মধ্যে সুপ্ত থাকে প্রতাপের বিরুদ্ধে চেতনার জয় ঘোষণা আর থাকে প্রতাপের ছটায় যৌবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

ঔপন্যাসিক দেবেশ তাঁর 'যযাতি' উপন্যাসে সমগ্র বিশ্বের প্রতাপও পীড়নের সহস্র সহস্র নজিরের আঁধারে প্রতাপের বাদ্যযন্ত্রের সশব্দ আলোড়নের চাপায় পিষ্ট হওয়া হাড় নিমজ্জিত পীড়িতদের আত্মকথনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে প্রতাপের শেষ আক্ষেপের রূপ নির্মাণ করেছেন।

পিতা গিরিজামোহন তার সুপ্রতিষ্ঠিত সংসারে সর্বত্র কর্তৃত্ব ছড়িয়ে ভালোভাবেই যৌবন কাল কাটিয়েছেন। সংসার ধর্মে কোথাও কোনো দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি তিনি দেখতে পাননি। তাই পরিণত বয়সে যখন তিনি পুত্রহারা তখনও তার আত্মকথনে এই কথাই বলেন—

> ''আমার নিজের ভিতরে যদি তাকাই কুত্রাপি অনুতাপ খুঁজে পাই না। আমার পথ ঠিক পথই ছিল। মনে হয় খোকারই ভুল, খোকারই।''[২৫]

কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি সেই কর্তৃত্ব স্থাপনের মধ্যেই রয়েছে শোষণের এক সুপ্ত ক্রিয়া শোষণের এই সমস্ত সুপ্ত ক্রিয়াগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে মিশেল ফুকো একসময় বলেছিলেন,

> ''It is a type of power which is constantly exercised by means of survillance rather than in a discontinuous manner by means of a system of levies or obligations distributed over time.''[২৬]

মিশেল ফুকোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গিরিজামোহনের প্রতাপের বিচ্ছুরণ স্পষ্ট। কিন্তু স্বয়ং গিরিজামোহনই যখন এই অনুভূতি থেকে দূরে ছিলেন কিংবা এর স্রষ্টা ছিলেন তখন দাসত্ব প্রথা তো অনিবার্য ছিল অথচ সমস্ত কিছু না জেনেও তিনি এই আঁধারেই খোকার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের ছিন্ন হওয়ার কারণ খুঁজছিলেন—

'খোকার সঙ্গে কি কোনোদিনই আমার ভাল সম্পর্ক ছিল,
এমন সম্পর্ক যেখানে একপক্ষ থেকে আনুগত্য আর
দাসত্ব, অপরপক্ষ থেকে আদেশ ও প্রভুত্ব।"[২৭]

মালিক শ্রেণির কেন্দ্রবিন্দু গিরিজামোহন আপন আধিপত্য স্থাপনে কোনো ত্রুটি রাখেননি। গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহসজ্জা, আচার-আচরণ চলাফেরা, পোশাক-আশাক ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই নিজের আধিপত্য স্থাপনে ঢাক-ঢোল পিটিয়েছেন। গৃহ প্রবেশে, শয়নগৃহে সন্তানদের এমন এমন ছবি বিশাল আকৃতিতে লাগিয়েছেন যা দেখে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। অপরদিকে খোকার ভাবজগতে ছবিগুলো এতই ঠুনকো যে আত্মতৃপ্তি তো দূরে থাক ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া যেন এইগুলো আর কিছুই নয়। পরিণত বয়সে তিনি যখন গোটা জীবনটাকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেন তখন জীবনের কোনো বিষয়েই কোনো অঙ্ক তিনি মেলাতে পারেন না। একদা তার পিতা তার নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিলে তিনি ভাইদের মধ্যে তা ভাগাভাগি না করে সমস্ত কিছু দেখাশোনার ভার ছোটভাইদের উপর দিয়েছিলেন। এতে কোনো অপরাধ আছে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু খোকা তার ভাবজগতে অন্যরকমই ধারণা পোষণ করছিল। কলকাতায় নিরিজামোহনের বাড়িতে বিভিন্ন বার্তালাপে খোকা গিরিজামোহনের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে, অথচ সেখানেই তীব্রভাবে নিরিজামোহনের দাদা কিংবা সহোদরা হিসেবে গিরিজামোহনের উপস্থিতি কাম্য ছিল। খোকা দেখতে পায় গ্রামবাড়িতে তার ছোট কাকার হাড় ভাঙা খাটুনি অথচ মালিকানা তার পিতার হাতে বাড়িতেও একই ব্যাপার, কোম্পানির শেয়ার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে খোকার মা অর্থাৎ রেণুর নাম থাকলেও কর্তৃত্ব স্থাপন করেন গিরিজামোহন এই ব্যাপারগুলো থেকে খোকার ধারণা আরও দৃঢ় হয় এবং সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তার পিতা তার ভাইদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে এবং স্ত্রীকে তার অধিকার থেকে। অপরদিকে পিতা পুত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোথায় হারিয়ে যায় রেণুর আত্মকথন। রেণু ভুলে যায় তার নিজেরও একটা জীবন আছে। কিন্তু বর্তমান সাহিত্য রেণুকে এইভাবে হারিয়ে যেতে দেবে না। তত্ত্বের

আড়ালে রেণুর অস্তিত্ব যে আরও প্রবল হয়ে উঠতে তা তাত্ত্বিকের নিম্নলিখিত বাক্য থেকে স্পষ্ট—

> ‘‘অস্তিত্বের চিহ্নায়ন প্রকরণ শুধুমাত্র বৌদ্ধিক পরিসরে নির্ধারিত হবে না আয়; ভোগবাদের তুমুল হল্লোড়ে নিমজ্জমান জনতার দ্রুত সঞ্চরমান অভিজ্ঞতা থেকে অস্তিত্বের একক ও সামূহিক বাচনের নতুন বিধি বিন্যাস নির্ণয় করতে হবে।’’[২৮]

ছোটবেলা থেকে রেণু তার মা বাবার সম্পর্ককে আদর্শ সমপর্ক হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে কয়েকটি বিষয় তার কাছে স্পষ্ট ছিল যে তার দাদু বংশ মর্যাদা বাড়াতে গিয়েই তার পিতার সঙ্গে তার মায়ের বিবাহ দিয়েছেন। পরবর্তীতে তার পিতা সমাজে প্রতিষ্ঠা বাড়াতে গিয়ে গিরিজামোহনের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন সুতরাং লালসার ব্যাপারটা একই থেকে যায়। তাই এই তিন পীড়িত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা মিল অবশ্যই আছে। রেণু ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে তার মা, বাবা, জ্যাঠা মশাই জ্যাঠিমা প্রত্যেকের মধ্যে গভীর মিল। কিন্তু তারপরও তার পিতা কেন জ্যাঠমশাইকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন এর সঠিক কারণ রেণুর কাছে তখন স্পষ্ট ছিল না। গিরিজামোহনের তার ভাইদের প্রতি একই ব্যবহারে রেণুর সেই অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট রূপ খুঁজে পায়।

গিরিজামোহন তার স্ত্রী রেণুর উপর সদাই কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। সমস্ত ব্যাপারে এমন কী পোশাক আশাক সাজ সজ্জাতেও যেখানে রেণুর একান্তব্যক্তিগত অধিকার থাকার কথা ছিল সেখানেও গিরিজামোহনের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। গিরিজামোহন তার জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে উপলব্ধি করেছিলেন যে রেণু তার স্ত্রী এবং রেণুর অস্তিত্ব কেবল গিরিজামোহনের প্রয়োজনেই হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে গিরিজামোহনের ধারণা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু খারাপ ধারণা পোষণ করার কোনো সঠিক কারণ তিনি পরিণত বয়সে খুঁজে পাননি। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত যত্নই তিনি পেয়েছিলেন

শ্বশুরবাড়ি থেকে, তাছাড়া সম্পত্তির দিক দিয়েও তারা ফেলনা নয়। বিয়ের সময় পণ হিসেবেও গিরিজামোহন প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিল যা দিয়ে মূলধনের অঙ্কটাকে তিনি আরও একটু বাড়াতে পারেন। তবে কি শ্বশুর বাড়ির লোকেরা চাষা বলেই তার আপত্তি এবং রেণু সেই চাষা বাড়িতেই বড় হয়ে উঠেছে তাই নিয়ে রেণুর প্রতি গিরিজামোহনের এত আপত্তি? গিরিজামোহন যখন রেণুকে বলেন—

> ''তোমার বাপের বাড়ির চাষাড়ে অভ্যাস ছাড়ো, একটু সভ্যভদ্র হয়ো।''[২৯]

তখন চাষাড়ে অভ্যাস ও সভ্যভদ্র হওয়া এই দুইয়ের সঠিক অর্থ তার কাছে স্পষ্ট ছিল না কিন্তু রেণু এর অর্থ ঠিক বুঝতে পেরেছিল তাই নিজের বাহ্যিক পরিবর্তনে সে বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করেনি। গিরিজামোহন তার পরিণত বয়সে এর অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা অবশ্যই করেছিলেন—

> ''আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, গ্রাম গ্রাম ভাব, আচার-অনুষ্ঠানে গোঁড়ামি এগুলোই চাষাড়ে মনে হয়েছিল বোধ হয়। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা একটু ভেবেচিন্তে আস্তে আস্তে কথা বলা সবকিছু খুলে মেলে উদোম না করে একটু সূক্ষ্মতা ও ব্যক্তিগত অভ্যাসের চর্চা—এগুলোই সভ্যতা।''[৩০]

রেণু বিনাপ্রতিবাদেই সব মেনে নেয়। সে তো জানতই তার বাবার বাড়ি চাষাড়ে, এতে অসত্য কিছু নেই কিন্তু অপমানজনকও কিছু নেই। গিরিজামোহন দেখতে পায় রেণু ও তার সম্পর্কে কোনো ফাটল নেই, সব কিছুই কত শান্ত ও স্বাভাবিক। গিরিজামোহন যেমন যেমন চেয়েছিল রেণু তো ঠিক তেমন তেমনই কিংবা ঠিক তেমন তেমন করেই নিজেকে তৈরি করে নিয়ে ছিল। পান খাওয়াতে চাষাড়ে বাড়ির ছাপ ফুটে উঠতে পারে তাই গিরিজামোহনের নির্দেশে রেণুকে এলাচ খেতে হয়। অথচ পরিণত বয়সে এলাচের গন্ধে রেণু যখন গিরিজামোহনকে মোহিত করে ততদিনে গিরিজা মোহন স্বয়ং পান

খেতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি রেণুকে নিয়ে সর্বক্ষেত্রে সুখী, নিজ অঙ্গে তিনি রেণুকে ধারণ করে নিতে পেরেছেন, কোনো কোলাহল কোনো অস্বাভাবিকতা তাদের সম্পর্কে নেই। যৌবনে এই ঠুনকো সম্পর্কের অর্থ গিরিজামোহন বুঝতে না পারলেও পরিণত বয়সে যে সব স্পষ্ট হয়ে উঠে তা তার আত্ম কথনেই আন্দাজ করা যায়—

> ''আমার চোখ ছিল শুধু নিজের দিকে, আমার হাতে ছিল শুধু গ্রাস। রেণুর নতুন শরীরকে আমি ভোগ করেছিলাম ভোগীর মত। আমি দুহাতের গ্রাস ভরে মুখ পুরে আস্বাদ নিয়েছিলাম। সে ভোগে আমি তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর, কারণ রেণু আমার স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠত না, সে শুধু বিবশ হয়ে পড়ত, উদ্দীপনার ত আবার একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে, বিবশ আত্মসমর্পণের মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্যের বিরক্তিকরতাও নেই।''[৩১]

যে তৃপ্তিতে গিরিজামোহন তার যৌবনকাল কাটিয়ে দেন সেই তৃপ্তিই যে রেণুর কাছে কতটুকু ঠুনকো তা উক্তিটিতেই স্পষ্ট। বিয়ের পর রেণুর চাষাড়ে অভ্যাস যাতে ধরা না পড়ে তা নিয়ে গিরিজামোহনের হাজারো চেষ্টা। রঙ্গমঞ্চের নানা অভিনেত্রীর ছবি অনুযায়ী রেণুকে সাজিয়ে গুছিয়ে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করেন অপরদিকে রেণুকে যখন এমনই সাজ-সজ্জা, আচার-আচরণ ধারণ করতে হয় তখন প্রতিবাদের স্ফুরণ তার ভিতরে স্থান অবশ্যই পায় কিন্তু দাসত্ব প্রথা যে রেণুকে মুক্তি দেয়নি। তাই আনুগত্যই ছিল রেণুর একমাত্র স্বভাব। এই আনুগত্যের বশেই খোকা রেণুর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। রেণু স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে যত নিষ্ঠাবান হয়েছে ততই যেন খোকা রেণুর থেকে দূরে চলে গিয়েছে। ঠুনকো সম্পর্কগুলো রক্ষা করতে গিয়ে রেণু নিজের একমাত্র সত্যিকারের সম্পর্ককে হারিয়েছে। খোকাই তো একমাত্র রেণুকে বুঝতে পেরেছিল। অসৎ উপায়ে অর্জন করা ইট সিমেন্টের ইমারতের মধ্যে যে রেণুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল তা তো একমাত্র খোকাই বুঝতে পারে। তাইতো মুক্তির আস্বাদ নিতে

খোকা তাকে ডেকেছিল তার একান্ত আপন কক্ষে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে বলত রেণুকে যেখানে সে রেণুর জন্য নির্মাণ করছে এক ভিন্ন জগত, যেখানে নেই কোনো আধিপত্য আর নেই কোনো প্রতাপের বিচ্ছুরণ। কিন্তু সেদিন তো রেণু তা বুঝতে পারেনি কিংবা বুঝেও অস্বীকার করেছিল। এইজন্যই কি খোকা তার জন্মকেই একদিন অস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সেই অস্বীকারের তাগিদেই রেণুকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠে। রঙ্গ মঞ্চের যে সাজপোশাক গিরিজামোহনের কাছে সভ্যতার পরিচায়ক এবং রেণুর কাছে আদেশ বৈ অন্য কিছু না, তাই-ই খোকার কাছে ডামি মনে হয়। রেণু যেন তার ভেতরে আসল চেহারা চেপে রেখে বাইরের সাজপোশাকে এতটাই আবৃত হয়েছে যে দোকানে সাজানো ডামি ছাড়া সে আর কিছুই নয়। খোকা রেণুকে এইভাবে দেখতে চায়নি। জন্মের পর থেকে বাবার সঙ্গে খোকার আত্মীয়তা একটু বেশি ছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে দখল উপলব্ধি করতে পারে সেটা আসলে সম্পর্কের চেয়ে অধিক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা বা আধার। তখন থেকেই খোকা সেই উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজের রক্তকে ঘৃণা করতে শুরু করে। খোকার কাছে মুক্তির কোনো পথ নেই অথচ মুক্তি তার একান্ত আবশ্যক। নিজের জন্মকেই যদি সে হত্যা করতে পারত তবে হয়তো মুক্তি সম্ভব ছিল।

গিরিজামোহন কর্মজীবনেও দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। কোম্পানির শেয়ার কিনে কোম্পনিতে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টাতে মনমোহন বাবুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। মনমোহন বাবুও একই উদ্দেশ্যে গিরিজামোহনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরস্পরের স্বার্থে স্থাপিত হওয়া এই বন্ধুত্বে গিরিজামোহনের কাছে কোনো অপরাধ বোধ নেই। অথচ এই সম্পর্ক নিয়েই খোকার এত আপত্তি। গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে গিরিজামোহনের ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শহরে নির্মিত কোনো বাড়ি তার চোখে পড়লে সেই বাড়ির ছোট ছোট ত্রুটিগুলো তার চোখ এড়াতো না। তাই নিজের বাড়িকে তিনি নির্মাণ করেছিলেন সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত এক ডায়াগ্রামে। কিন্তু বাধা দেখা দিয়েছিল বাড়ির জায়গা কিনতে। সামান্য বেতনে যদি তিনি রাস্তার ধারে কোনো জায়গা অধিক মূল্যে কিনতেন তবে বিভিন্ন

প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। তাই গলির ভেতর একটু কাদা কাদা জমিই তিনি কিনলেন। তাছাড়া কোম্পানির শেয়ার কেনা, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজই স্ত্রী রেণুর নামেই তিনি করেছিলেন যাতে তার সম্মুখে কোনো প্রশ্ন না আসে। গিরিজামোহনের বোধে এতে কোনো অপরাধ নেই হিসেবের অঙ্কে কোনো গোলমাল না হওয়ার জন্য এবং মূলধন ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ানোর খাতিরে যদি তিনি রেণুর নাম ব্যবহার করে থাকেন তবে খোকার কেন আপত্তি খাকবে—এই বিষয়টি গিরিজামোহনের কাছে তখন স্পষ্ট ছিল না। অথচ এই বিষয়গুলোই রেণুর কাছে অন্যরকম ঠেকে। অফিসের কারচুপি থেকে যখন গিরিজামোহনের অর্থ আসতে থাকে তখন গিরিজামোহনের লোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। মনমোহন বাবুকে ব্যবহার করে কোম্পানির শেয়ার অধিক মাত্রায় কিনে যখন তিনি ডিরেক্টর হন তখন মনমোহন বাবুকেই সরানোর চক্রান্ত তিনি করে বসেন। শুধু তাই নয়। পাকাপাকিভাবে ডিরেক্টর হতে এবং কোম্পানিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে কোনোরকম কুচক্রান্ত তিনি বাদ দেননি। কোম্পানির নামে আসা ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে তিনি নিজ বিলাস ভবন নির্মাণ করেন। রেণুর তাই তো এই বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অপরদিকে খোকা এই নির্মাণ থেকেই তার মা-কে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। বাড়ির বাইরের বাগানটাকে তাই সে নিজের ইচ্ছে মত সাজাতে চায়। তার শয়নগৃহের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে সে এমন এক ভুবন নির্মাণ করে যেখানে নেই তার পিতার আধিপত্য আর নেই রেণুর দাসত্ব বোধ। আছে কেবল মুক্ত আকাশ আর সবুজ পৃথিবী। রেণু সেই আকাশ আর পৃথিবীকে কোনোভাবেই চিনে নিতে পারত না। খোকার তাই বড় রাগ হত। গিরিজামোহনের প্রতি মায়ের এই দাস দাস ভাবটাই তাকে নিজের রক্তের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে বাধ্য করে। সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা মায়ের হাতে অথচ রেণুই হামেশা দাস হিসেবে সংসারে রয়েছে। মায়ের চেয়ে তো তার বেস্যা পাড়ার তাঁর কিনে নেওয়া সেই মেয়েটাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বলে মনে হয় যে মেয়েটা খোকার সঙ্গে শারীরিক মিলনে অন্তত একটা হাতকে অদ্ভুতভাবে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। তবে রেণু কেন সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল

না? খোকাকে এই যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে এমনভাবে নিঃশেষ করে দিল যে সে তার মায়ের উপর হামলা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। খোকা তার জীবন থেকে জন্ম থেকে মুক্তি চায়, খোকার আত্মকথনে তার মুক্তি কামনা স্পষ্ট—

> ''মাকে মারতে গিয়েছিলাম। তার কারণ দুটো। একমাত্র মার সঙ্গেই আমার যা কিছু যোগাযোগ ছিল সেটা চিরকালের জন্য শেষ করে দিলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভবিষ্যতের সঙ্গে আমি লগ্ন হতে পারি। আর তাছাড়া আমার মা-ই তো গিরিজামোহনের প্রথম বিনিয়োগ ক্ষেত্র। যখন সে শিল্পপতি হয়নি, তখন থেকেই তার ব্যক্তিত্ব আমার মায়ের ওপর চাপিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বশে এনেছে। শাদা সেল ডিডে সই করে মা আমার গিরিজামোহনের ঐ শিল্প সাম্রাজ্যের দক্ষিণী। সেই দক্ষিণীর দুটি পায়ের ওপর ভর দিয়ে যে প্রাসাদ তৈরি হয়েছে, তা কি টেঁকে, যদি যক্ষিণী তার পায়ের ভঙ্গি বদলায়।''[৩২]

দেবেশ রায়ের কথনবিশ্বের সাধারণ পরিচয় আলোচনা করতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক এই অধ্যায়ে চলে আসে এবং সাধারণের মধ্য দিয়ে যে নগ্নতা দেবেশ রায় উপস্থাপন করেন তাও এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই অধ্যায়ের শেষ গল্প 'সহমরণ' দেবেশ রায়ের কথন বিশ্বের আরও একটি দিক নির্ণয় করে।

'সহমরণ' উপন্যাসটি দেবেশ রায়ের রচিত এমন একটি উপন্যাস সেখানে 'মরণ' এই তিন অক্ষরে গঠিত শব্দটির পেছনে লুকিয়ে আছে জীবনে ধ্রুব সত্য। জীবনও মরণের সন্নিকটতা কিংবা দূরত্ব কতখানি হতে পারে তাই আলোচিত হয়েছে 'সহমরণ' উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা না করলে তা হয়তো স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

কলকাতা শহরের ফ্ল্যাটে বাস করা এক উচ্চ মধ্যবিত্ত ছোট পরিবারের কাহিনি এটি। প্রাণকিশোর তণিকা, রনি এবং তনিকে নিয়ে গঠিত এই পরিবার। দৈনন্দিন জীবনযাপনে তাদের কোনো অসাধারণত্ব নেই। পেশায় প্রাণকিশোর একজন ডাক্তার তবে তার ডাক্তারি পেশাগত সীমায় আটকে থাকেনি। রোগীকে সুস্থ করে তুলতে তিনি কোন ত্রুটি রাখেননি। রোগী সুস্থ করার সিদ্ধহস্ত নিয়ে যখন তিনি জলপাই গুড়ি বদলি হন ঠিক তখনই এর পরিচয় পাওয়া যায়। বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত জলপাইগুড়ি যেন তারই অপেক্ষায় বসেছিল। ক্রমাগত রোগীর সেবা ও তাদের সুস্থ করে তোলায় হাসপাতালের সর্বে সর্বা হয়ে উঠে প্রাণকিশোর। রোগীর সেবা চিকিৎসা, শুশ্রুষা করতে কোনো অলসতা ছিল না তার। ওভারটাইম কাজ করা প্রাণকিশোরের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। পুরোদিন রোগীদের সঙ্গে কাটানোর ফলে মৃত্যুকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। এমন কী রোগীর সেবা করতে করতে একবার রোগীর শরীরের বিষ তিনি নিজের শরীরে নিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর বেশ কয়েকদিন তাকে অবজারবেশনে থাকতে হয়। জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুললেও রোগীর সেবায় কোনো বিরক্ত বোধের চিহ্ন তার চরিত্রে নেই। চাকুরীসূত্রে তাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যেতে হয়। সেই যাওয়া আসার মধ্যে প্রাণকিশোর রোগীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিতেন। শুধু রোগী কেন সহকর্মী, সিনিয়র জুনিয়র সকলকে প্রভাবিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল প্রাণকিশোরের। পেশাগত জীবনে তার কোনো অসন্তুষ্টি ছিল না। রোগীর সেবা নিয়ে তার সমালোচনা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লেও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। বলতে গেলে পেশাগত জীবনে সফলতার চরম শিখর ছুঁয়েছিলেন তিনি।

সফল প্রাণকিশোরের পারিবারিক জীবনের দিকে এবার একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। উপন্যাসের শুরুতেই প্রাণকিশোরকে ডাক্তার হিসেবে সম্বোধন করতে দেখি আমরা। তবে যদি আমরা অনুচ্ছেদটিকে একটু খুটিয়ে পড়ি তবেই দেখতে পাব প্রাণকিশোর এখানে ডাক্তার কম প্যাশেন্টের কাছে লোক বেশি। স্ত্রী তনিকার ব্লাড রিপোর্ট তিনি সংগ্রহ করতে যাবেন। 'সহমরণ'-এর শুরুতে তনিকার মারাত্মক রোগের কোনো ব্যাখ্যা

আমরা দেখতে পাই না। এমনকী স্বামী প্রাণকিশোরের চেহারা ছবি, হাব-ভাবেও কোনো ইঙ্গিতের প্রকাশ নেই। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনি যতই এগিয়ে যায় প্রাণকিশোরের চিন্তা-চেতনায় ততই পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তনিকার শারীরিক গঠনের দ্রুত পরিবর্তন প্রাণকিশোরের মত ফুরফুরে মেজাজের লোকটাকেও ভাবতে শেখায়। প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাওয়া তনিকার দৈহিক গঠন দেখে প্রাণকিশোর মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা দেখতে পায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে মানুষটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ছিল সেই মানুষটি তার চোখের সামনে মুহূর্তে মুহূর্তে মরছে। প্রকৃতির এ কী নিয়ম, যা প্রাণকিশোর দেখছে অথচ কিছুই করতে পারছে না। ডাক্তার প্রাণকিশোর, যিনি বহুলোকের প্রাণ বাঁচিয়ে সকলের 'হিরো' হয়েছিলেন সেই প্রাণকিশোরই স্ত্রী তনিকার চিকিৎসায় অসমর্থ প্রমাণিত হলেন। অসহায় অবস্থায় তনিকায় মরা দেখা ছাড়া প্রাণকিশোরের আর কিছুই করার ছিল না। তনিকাকে ঘিরে যে চিন্তা চেতনা প্রাণকিশোরকে আচ্ছন্ন করে সে চেতনার মধ্যে জীবিত অবস্থা ও মৃত অবস্থার যে গভীর অমিল অথচ সন্নিকটতা রয়েছে তা বার বার উঠে আসতে দেখি—

> "... প্রাণকিশোর শরীরে কোনো পরাজয় দেখতে পায় না—শরীরের বিরতিহীন জয়োৎসব, মৃত্যু এখানে কী অবাস্তব, অসত্য। অথচ মৃত্যুর অনিবার্যতা ছাড়া বাঁচা কী অপ্রাসঙ্গিক।"[৩৩]

প্রাণকিশোর তার প্রতিদিনের যাতায়াতের চেনা পথগুলো দিয়ে যেতে যেতে কখনও কখনও এমনই মত্ত হয়েছিল যে কিছুক্ষণের জন্য তনিকার ভাবনা থেকে সে অনেক দূরে সরে যায়। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর সাথে প্রকৃতি যে নিয়মিত জড়িত রয়েছে। প্রকৃতির মুক্ত হাওয়ায় যেমন প্রথম মানব জন্ম হয়েছিল মৃত্যুর পরও তো তেমনি মানবদেহকে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে যেতে হয়। তবে এই প্রকৃতিকে কীভাবে অবহেলা করা যায়। প্রকৃতি আর মৃত্যুর এই সম্পর্ক প্রাণকিশোর কোনমতেই অবহেলা করতে পারেনি। তাই কলকাতার জলাশয় ঝোপঝাড় দেখতে দেখতে, রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে, অপেক্ষারত অসংখ্য মানুষ দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে যায় মানুষের বেঁচে থাকার

আপ্রাণ চেষ্টা, তনিকার বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা। অথচ তনিকা আর বাঁচবে না। মুহূর্তে প্রাণকিশোর যেন চেতনা ফিরে পায়। কারণ তনিকার মরা দেখা শেষ হয়নি। যত দিন যাচ্ছে তনিকা ততই মরছে। প্রাণকিশোরের শরীরে যেমন বেঁচে থাকাটাই সত্য তনিকার শরীরে তেমনি মৃত্যুটাই বাস্তব, যাকে অস্বীকার করা যায় না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে তনিকা যতই শক্তিশালী উপাদান প্রদান করুক না কেন এখানে মৃত্যু অপরাজেয়, তনিকার রক্ত শূন্যতা তাকে জিতত দেয়নি। রক্ত দেওয়ার সাতদিন পর থেকেই তনিকার শরীরে রক্তের পরিমাণ আবার কমতে শুরু করে। ফলে আবার শরীরে লক্ষণ সমূহের পরিবর্তন ঘটে। প্রাণকিশোর তনিকার শরীরের এই পরিবর্তনগুলোর সাথে নিজের পরিচয় ভালো করে করিয়ে নেয়। মৃত্যুর আর তনিকা যেন এক হয়ে যাচ্ছে, প্রাণকিশোর দেখতে পায়। অতৃপ্ত চেনা শরীর প্রাণকিশোরের কাছে চেনা আবার কখনও কখনও অচেনা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। তনিকার পুরো দেহটি প্রাণকিশোরের কাছে শীর্ণ হলেও পরিচিত। আবার এই দেহটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে যখন সে আলাদা আলাদাভাবে দেখে তখন প্রাণকিশোর আর কিছুই চিনতে পারে না। মৃত্যু যেন প্রাণকিশোর আর তনিকার মাঝখানে এসে সব ঘোলাটে করে দিচ্ছে। সেদিন প্রাণকিশোরের কাছে সব অজানা, সব অচেনা, এমন কী তনিকার শীর্ণ আঙুলগুলো পর্যন্ত অনেক দূরের কোনো যন্ত্রণাময়ী ব্যক্তির বলে মনে হয় অথচ এই শীর্ণ আঙুলগুলো যখন তাকে স্পর্শ করে তখন সে স্পর্শ যেন জন্ম জন্মান্তরের। মৃত্যু নামক নিষ্ঠুর মুহূর্তটি সে জন্ম জন্মান্তরের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ককে কীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে তা প্রাণকিশোর ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করছিল। সে দেখতে পায় তনিকা মরছে। আর কিছু সময়ের মধ্যেই বেঁচে থাকার কোনো লক্ষণ তনিকার শরীরে থাকবে না। প্রতিটি মুহূর্ত প্রাণকিশোর আশঙ্কায় কাঁপছে।

> ‘‘চোখ বোজা, গলা পর্যন্ত চাদর চাপা শরীরটার দিকে সামান্য একটু তাকিয়ে থাকতেই প্রাণকিশোর দেখে, চাদরটা যেন আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে তনিকাকে মাথা পর্যন্ত ঢাকতে।’’[৩৪]

মৃত্যু তনিকাকে এবার আরও আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরছে। পৃথিবীর সমস্ত মায়াজাল ত্যাগ করে তনিকা তার জীবনের শেষ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছাবে, আজ জীবনের কোনো সমস্যাই তনিকার কাছে সমস্যা নয়। সে নিশ্চিন্ত, দায়মুক্ত, সমস্যাহীন, বাধামুক্ত, কোনো সঙ্কট নেই তার, প্রাণকিশোর তনিকাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। তনিকার কাছে আজ কোনো সত্যের কোনো মূল্য নেই। সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত চেষ্টা সবকিছু তনিকার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। এখন কেবল শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা। প্রাণকিশোরের প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল এই বুঝি তনিকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তনিকার শরীর যখন প্রায় জড় হয়ে গেছে, প্রাণের আর কোনো লক্ষণ নেই তখনও প্রাণকিশোরেরর ডাকে শরীরের সমস্ত শক্তি একসাথে করে তনিকা সাড়া দেয়। তনিকার দেহে আজ মৃত্যু এতটাই সত্য। মৃত্যু নামক কাঁকড়া তনিকার দেহকে ভেতর থেকে কুঁড়ে কুঁড়ে এমনই ফাঁপা করে দিয়েছে যে কয়েক ফোঁটা জল গিলতে গেলেও বুঝি তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তনিকার চোখ দুটো স্থির, প্রাণর কোনো লক্ষণ নেই। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে এবং মৃত্যুর ঘণিষ্ঠতায় মৃত্যুর নিষ্ঠুরতর হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। রুগ্ন শুষ্ক মুখের দাঁতের পাটি তনিকার বেরিয়ে এসেছে, ঠোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে। গলায় জলের ঘড় ঘড় আওয়াজ তনিকার। এর পর সে হয়তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তনিকার মৃত্যুর এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় দেবেশ রায় তাঁর অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতার রাত্রির শেষ সময় টুকুর বর্ণনার মাধ্যমে তনিকার শবদেহ যাত্রার কাজ যেন সম্পন্ন হয়। প্রভাতের প্রথম আলো যখন তনিকার দেহে পড়ে তখন প্রাণকিশোর দেখে—

> ‘‘তনিকার মরা তখনো শেষ হয়নি, শূন্যতায় দাঁত বিঁধিয়ে মুখ হ্যাঁ করে তনিকা শুয়ে, প্রায় নিস্পন্দ শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস, আর তার সারাটা শরীর হলুদ কপাল থেকে পা পর্যন্ত চামড়া যতটা দেখা যায়। সারা রাত কেউ মুখ গলা-হাত-পা গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিয়ে গেছে যেন। রাত্রিতে

কোনো এক সময় লিভারের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, রক্ত তার গতিপথ হারিয়ে ফেলছে, বিপর্যস্ত রঙের ধ্বস্ত কনাগুলো শিরা-উপশিরা-নারী ঝিল্লির জটিল গহণে ছড়িয়ে পড়ায় তনিকার মরণের নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তনিকার সরু, লম্বা, হলুদ হাত বিছানার ওপর পড়ে ছিল।"[৩৫]

জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যু বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম দূরত্বে অবস্থিত এই দুই মেরু সর্বাধিক সন্নিকটও, একে অপরের উপর নির্ভরশীল এই দুই মেরুর দূরত্ব এবং সন্নিকটতা প্রমাণ করতেন যেন উপন্যাসটির অবতারণা। মৃত্যু নামক ধ্রুব সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই কিন্তু এই মৃত্যুর প্রত্যক্ষসাক্ষী হওয়া যে কত বেদনাদায়ক তা প্রাণকিশোরকে না দেখলে অনুমান করা যায় না। ঔপন্যাসিক তনিকার হৃদযন্ত্রের প্রতিটি সাড়া যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি প্রাণকিশোরের মনের অবস্থার প্রতিটি ধাপ ও দেখতে পেয়েছেন। সেই উপলব্ধির বশেই যখন তনিকার মৃত্যু কাহিনি ঔপন্যাসিকের লেখনী ধারণ করে তখন সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তা নিছক কাহিনি না হয়ে জীবন্ত ঘটনা হয়ে উঠে।

তথ্যসূত্র—

১। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ৫, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃঃ-৫।

২। অনিন্দ্য সৌরভ, শিল্পসাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা ২০১০, পৃঃ-১৪৪।

৩। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ৬, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০০, বৈশাখ ১৪০৭, পৃঃ-৪।

৪। অনুরূপ, পৃঃ-২।

৫। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ-৪।

৬। অনিন্দ্য সৌরভ, শিল্পসাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা ২০১০, পৃঃ-৭৩।

৭। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ-৩৬।

৮। অনুরূপ, পৃঃ-৪৩।

৯। অনুরূপ, পৃঃ-৫২।

১০। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ৪, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃঃ-১২৬।

১১। অনুরূপ, পৃঃ-১৪০।

১২। তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃঃ-১১৪। পৃঃ-১১২। পৃঃ-১১৩।

১৩। দেবেশ রায়, গল্পসমগ্র ৫, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃঃ-৮৬।

১৪। দেবেশ রায়, নভেলজোড়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ১৪১৩, পৃঃ-৫৫।

১৫। অনুরূপ, পৃঃ-৫৬।

১৬। অনুরূপ, পৃঃ-৫৫।

১৭। অনুরূপ, পৃঃ-৬০।

১৮। অনুরূপ, পৃঃ-৯৮।

১৯। অনুরূপ, পৃঃ-১০৬।

২০। অনুরূপ, পৃঃ-১২৩।

২১। দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২, পৃঃ-২৬।

২২। দেবেশ রায়, জন্ম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, মাঘ১৪০৩, পৃঃ-৮৭।

২৩। দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনে খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২, পৃঃ-৩০।

২৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৭ আগস্ট ২০০৭, পৃঃ-৯৮।

২৫। দেবেশ রায়, যযাতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ বইমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, মাঘ ১৩৯৭, পৃঃ-১৭।

২৬। তপোধীর ভট্টাচার্য, মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৭ আগস্ট ২০০০, পৃঃ-১০২।

২৭। দেবেশ রায় , যযাতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ বইমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, মাঘ ১৩৯৭, পৃঃ-৯।

২৮। তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃঃ-২৩৩।

২৯। দেবেশ রায় , যযাতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ বইমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, মাঘ ১৩৯৭, পৃঃ-১৪।

৩০। অনুরূপ, পৃঃ-১৫।

৩১। অনুরূপ, পৃঃ-১৩।

৩২। অনুরূপ, পৃঃ-১৫০।

৩৩। দেবেশ রায়, সহমরণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫, ৮ মে ১৯৮৮, পৃঃ-৪৭।

৩৪। অনুরূপ, পৃঃ-১৩১।

৩৫। অনুরূপ, পৃঃ-১৫২।